# PAPER III

# একক ১ ❑ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

গঠন ঃ

১.১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কী? (What is Indian Nationalism ?)

১.২ উজ্জীবনের স্তর (Levels of Response)

## ১.১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কী? (What is Indian Nationalism?)

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সাধারণভাবে পলাশীযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সাপে(, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাখ্যা করা হয়। জাতীয়তাবাদ যে ইতিমধ্যেই ভারতীয় মনে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে জনগণের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে এবং ঔপনিবেশিক শাসন যে তাতে শুধু অনুঘটকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা তর্ক সাপে( এবং একে বলা যেতে পারে, ''teleological model of enlightenment history''. যা কিনা একীভূত এবং জোটবদ্ধ জাতির 'ধারণাকে' মিথ্যে বলছে। প্রকৃতপ(, বিস্তৃত পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের মধ্যে একটি সর্বসম্মত চিন্তা হল, ঔপনিবেশিক আঘাতে ভারতবাসী তাদের বহুধা বিস্তৃত সমাজে, অঞ্চল, ভাষা, ধর্ম, জাতি এবং বংশধারার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে একটি এক জাতিতে পরিণত করতে চাইল বা চিন্তা করল যা কিনা ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত, বা Bayly যাকে বলছেন। পূর্ববর্জিত আঞ্চলিকতার ধারণা এবং দেশজ নীতিবোধ থেকে উদ্ভূত দেশপ্রেমের পরম্পরা।

জাতিগঠনের প্রক্রি(য়াটি কিন্তু, তবুও তীব্র দ্বন্দ্ব এবং তর্কের বিষয় হয়ে রইল। পার্থ চ্যাটার্জী ভারতীয় জাতিকে পশ্চিমের দেশগুলো থেকে কিছুটা পৃথক, যদিও তাদের ধারণা উদ্ভূত (derivative discourse), বলে মনে করেন। আশীষ নন্দীও মনে করেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রি(য়াতেই পুষ্ট। It was ''shaped by what is was responding to.'' এভাবেই রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধির বি(জননীতার ধারণার পরিবর্তে তত্ত্বটি পশ্চিমি জাতি-রাষ্ট্র (Nation State) model-এর ধারণাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্পর্কে তর্কের উৎপত্তি প্রাথমিক ঔপধনবেশিক তাত্ত্বিকদের ধারণা যে জাতীয়বাদ হচ্ছে এক অণুবী( ণিক সংখ্যালঘু (Microscopic minority)-দের সৃষ্টি, যাঁরা সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত। 1888 সালে স্যার জনস্ট্র্যাচি (John Strachey) কেমব্রিজের স্নাতক ছাত্রদের বলেন, ''There is not, and never was, an India, or even eny Country of India.... no Indian nation, no people of India of which we hear so much.. that men of the Punjab, Bengal, the North West Provinces and Madras, Should ever feel that they belong to one great Indian nation, is impossible.'' পরবর্তীকালে, Valentine Chirol বলেছেন, যেটাকে ভারতীয় জাতি বলে দেখা হচ্ছে তা হল পৃষ্ঠপোষক পরিসেবা প্রাপ্ত সম্পর্কের রাজনীতিকরণ (the Politicization of Patron-client relations), ভারতীয় সমাজ এগিয়েছে মূলত ঐতিহ্যবাহী সমাজ গঠনের পথেই, আধুনিক জাতি-গঠন প্রক্রি(য়ায় নয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা R.C. Mazumder-এর নেতৃত্বে এই ধারণার বিরোধিতা করে, ব্যাখ্যা দেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিক সরকারের ক্র(মবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্য এবং শোষণের বি(দ্ধে জাতীয় সংগ্রাম এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ থেকেই সৃষ্ট।

The Namierist Cambridge School, যাঁদের নব্য-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক বলে চিহ্নি(ত করা হয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁদের কাছে ভারতের ঔপনিবেশিক অতীত হল সহযোগিতা এবং বিরোধীতার ইতিহাস। ব্রিটিশ দেখল যে, ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে সম্পদ, ( মতা এবং গরিমার জন্য প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত। ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক শ্রেণির ভারতীয়ের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন হল, যা স্বাভাবিক কারণেই অন্য শ্রেণিগুলোকে সরকারের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলল। স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে বিরোধিতা অবশেষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হল যদিও এটা সম্ভব হল পাশ্চাত্য ভাবধারা এবং পশ্চিমি কায়দায় আর্থরাজনীতিক গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে। শেষ বি(েষণে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছিল কেবলমাত্র একটি ''Loose Coalition,'' Namier লিখেছেন, ''Idealism and Idealists are misnomers'' এবং অনিল শীলের বক্তব্যে এরই প্রতিধ্বনি, ''Ideology Provides a good tool for fine Carving, but it does not make big buildings.''

কেমব্রিজের তাত্ত্বিকদের মত বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। Namier-কে সমালোচিত করে Prof. Butter field বলেন, ''... human beings are carriers of ideas as well as repositories of Vested interests.'' এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে Christopher Hill বলেন, ''I do not believe that material conflicts are the only ones deserving Serious analysis.''

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কেমব্রিজের তাত্ত্বিকরা ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে মনন এবং আবেগকে অপসারিত করে জাতীয় আন্দোলনকে এমন স্তরে নিয়ে গেছেন যা কিনা তপন রায় চৌধুরীর মতে একটা ''animal Politics.'' এ ধরনের বি(েষণ এবং ব্যাখ্যা এখন এমনকি সংশোধনবাদী কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরাও মেনে নেন না। C.A., Bayly'র ''Origin of Nationalities in South Asia (1998)'' এই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চ্যুতিকে মনে করিয়ে দেয়। যা কিনা নেমিয়ার পন্থীরা, Gallagher, Seal, Johnson এবং এমনকি Judith Brown ভীষণভাবে এড়িয়ে গেছেন, তা হল, ভারতবাসীর নিজেদের দেশের জন্য বিপুল আত্মোৎসর্গ। Bipan Chandra এর মতে, সার্বিকভাবে ভারতীয় সমাজ এবং রাজনীতিকে উন্নীত করতে ভারতীয় আলোক প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অবদানের উল্লেখ ছাড়া ভারতীয় জাতিয়তাবাদকে বোঝা সম্ভব নয়। Prof. Sumit Sarkar'ও বলেন যে, ভারতের জাতীয় নেতৃত্বকে সঠিকভাবে বিচার করতে হলে, তাঁদের আর্থসামাজিক ভিত্তি এবং মূলত অনাগরিক (non-bourgeois) সমাজের ভিত্তিতে দেশপ্রেমের ধারণার যুগপৎ বি(েষণ প্রয়োজন।

কেমব্রিজের ঐতিহাসিকদের সংকীর্ণ রাজনীতিক ব্যাখ্যাকে প্রাচীন মার্কসীয় তাত্ত্বিকরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনরায় ব্যাখ্যা দেন। তৎকালীন সোভিয়েত ঐতিহাসিক V. I. Pavlor দ্বারা অনুপ্রাণিত এই তাত্ত্বিকদের ভারতীয় প্রবক্তা(া হিসাবে R.P. Duttকে ধরা যায়। মার্কসীয় তাত্ত্বিকরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেণি চরিত্রকে বি(েষণ করেন এবং এই আন্দোলনকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, শিল্পে পুঁজিবাদের বৃদ্ধি এবং বাজার অর্থনীতি শিল্প সমাজের সৃষ্টি ইত্যাদির সাপে( ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে জাতীয় আন্দোলন হল একদিকে শ্রমিক শ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(র বি(দ্ধে মুক্তি(র জন্য শ্রেণি সংগ্রাম এবং অপর দিকে বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে চালিত জাতীয় দলগুলির বি(দ্ধে সংগ্রাম, যে দলগুলি আন্দোলনকে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে চালিত করে জনগণকে প্রতারিত করছে। এই অতি-সিদ্ধান্তমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরবর্তী বামপন্থী তাত্ত্বিক যেমন S.N. Mukherjee এবং Bipan Chandra অনেকটা সংশোধিত করেন। মুখার্জী— জাতীয়তাবাদের বহুমুখী স্তর, তাদের জটিলতা এবং জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন অর্থকে দেখিয়ে দেন, যাতে বিভিন্ন জাতপাত এবং রাজনীতির আদি এবং নব্য ভাষার

যুগপৎ প্রয়োগের কথা বলা হয়। Bipan Chandra এবং তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের, ''India's Struggle for independence (1989)''-এ মার্কসীয় ব্যাখ্যার উপর একটা জাতীয়তাবাদী-গন্ধ-(Nationalist Flavour) আরোপ করেন এবং জাতীয় আন্দোলনকে কেবলমাত্র বুর্জোয়াদের ব্যাপার বলতে অস্বীকার করেন। তাঁরা এই যুক্তি( দেন যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল মুখ্যত জনগণের আন্দোলন, যদিও অন্যান্য গৌণ বিবাদের (তার্কিক) কোনও মীমাংসা হল না।

ভারতের জাতীয়বাদ যে কেবলমাত্র আলোকপ্রাপ্ত প্রভাবিত এবং পরিচালিত নয়, সে সম্পর্কে Subaltern তাত্ত্বিকরা তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। 1982 সালে Subaltern Studies এর প্রথম খণ্ডে (Ranajit Guha সম্পাদিত) যে দিশারী মন্তব্য করল তা হল ''(the) blinkered historiography (of Indian nationalism)'' কখনই সত্যকে উদঘাটন বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না কারণ তা উপে(া করছে যে ঘটনাকে তা হল ''the Contribution made by the people on their own, that is, independenty of the elite to the making and development of this nationalism.'' Subaltern ঐতিহাসিকরা বলেন যে ভারতীয় Subaltern'রা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং অন্তর্নিহীত বিদ্রোহী চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আঞ্চলিকতা এবং অদ্ভুত চিন্তাপ্রণীত হয়ে সবসময়ই ভারতীয় রাজনীতিতে একটি সমান্তরাল ভূমিকা পালন করেছেন।

Gyan Prakash, তাঁর সাম্প্রতিক পুস্তক ''Another Reason (1999)'' ওই Subaltern ধারণাকে সংশোধিত করে উন্নততর ধারণা দেন। তিনি বলেন, ''there was no fundamental opposition between the inmersphere of the nation and its outer life as a nation State ; the latter was the former's existence as another, abstract level.'' ''The nation-State was immanent in the very hegemonic project of imagininig and normalizing a national community. এই অন্তহীন তর্ক থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো শক্ত(, কোনও সিদ্ধান্তে আসা কি আদৌ সম্ভব অথবা, সমস্ত দ্বন্দ্বকে অতিত্র(ম করা কি অসম্ভব? সম্ভবত এটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে জাতি গঠন সর্বদাই একটি জটিল প্রক্রি(য়া যা কিনা বিরোধিতা, সমন্বয় এবং বহুমুখী সচেতনতার উজ্জীবনের সমন্বয় বিধান। ভারতীয় জাতির (ে ত্রেও এটা সত্য। Ania Lomba (Colonialist Past, Coloinalism. 1998), কে উল্লেখ করে বলা যায়, ভারতের বহুবিধ সমাজে (Plural Society) জাতীয়তাবাদের অনেকগুলো দিক থাকবেই— শ্রেণি, জাতি, ব্রাহ্মণ এবং দলিত, নারী এবং পু(ষ, হিন্দু এবং মুসলমান ইত্যাদি।

এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তীর্থযাত্রীরা বিভিন্ন পূণ্যস্থানে যাচ্ছে( ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য যেমন রামায়ন মহাভারত ইত্যাদিকে শ্রদ্ধা করছে( বিভিন্ন পুণ্য নদীতে পুণ্যস্নান করছে, মঠে এবং উচ্চ পর্বতগুহা-দর্শনে যাচ্ছে। এ সমস্তই ভারতকে সংস্কৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে' সূক্ষ্ম কলা ধর্মনিরপে( । সংগীত ছিল একটা মস্ত বড়ো Unifier। ভারতের সমন্বয়ের ঐতিহ্য অতিপ্রাচীন। চৈতন্য, কবীর, নানক নামদেব, রবিদাস এবং অনেক পীর এবং ফকির ভারতের মৌলিক একতাকে জোরালো করেছেন, ঔপনিবেশিককালে, রাস্তা, রেলযোগাযোগ, পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, মুদ্রাব্যবস্থা এবং বি(েবিদ্যালয় এবং শি(াব্যবস্থা ভারতের জনগণকে পারস্পরিক মিলিত হতে এবং রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইউরোপীয় ধারণা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রাজনীতিক জাতীয়তাবাদের ধারণাকে জোরালো করেছে। ভারতীয়দের দ্বারা এটা ছিল পশ্চিমি ধারণার আত্মীকরণ। স্বাধীনতা সংগ্রাম যে শুধু এটাকে ধারালো করছে তাই নয়, এটা দেশপ্রেমের এক গভীর চেতনা সৃষ্টি

করেছে যা কেবল ঔপনিবেশিক দেশেই দেখা যায়। জীবনের সর্বস্তরে দেশপ্রেম তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদকে ম্লান করেছে।

## ১.২ উজ্জীবনের স্তর (Levels of Response)

Bipan Chandra এর Modern India-তে বলা হয়েছে, ''Basically modern Indian nationalism arose to meet the Challenge of foreign domination.'' এই জাতীয়তাবাদী চেতনা যতই বাড়তে লাগল, ততই বেশি করে ভারতের সমস্ত শ্রেণির জনতা উপলব্ধি করল যে, ভারতের অনগ্রসরতা ব্রিটিশ শাসনেরই ফল এবং বিদেশি শাসকদের হাতেই তাদের স্বার্থ মার খাচ্ছে।

চাষিরা দেখল যে তারা ত্র(মশই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কারণ ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত তাদের উৎপীড়ক জমিদারদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্বার্থর(া করছে এবং ঠগ মহাজনদের পোষকতা করছে। বন আইন (Forest Act) দলিত জনজাতিদেরকে উচ্ছেদ করছে। শ্রমিক এবং মেহনতি মানুষ (Artisans & handicrafts man) ত্র(মশই হতাশ হতে থাকল কারণ শিল্পের দ্রুত সংকোচন ঘটছে যা, সাম্রাজ্যবাদী শিল্প-নীতিরই ফল। পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীতে, ফ্যাক্টরি-শ্রমিক, খনি-শ্রমিক এবং চা বাগানের শ্রমিকরা ল( করল যে, শাসকেরা মুখেই তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখায় কিন্তু প্রকৃতপ( পুঁজিপতিদেরই প( । এমনকি জমিদার এবং জোতদাররাও যাদের স্বার্থ এবং ঔপনিবেশিকদেরও স্বার্থ একই, বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়বাদীদের সঙ্গে হাত মেলালেন, যখন ব্রিটিশদের চূড়ান্ত বর্ণবিদ্বেষ তাঁদের আহত করল এবং তাঁদের মনে আত্মসম্মানের বোধ জাগাল।

সমাজের অন্যান্য অংশও সমানভাবে অসন্তুষ্ট হল। পশ্চাত্য-শি( ত বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণকে বি(-ষণ করতে পারল, যেমন R.C. Dutt তাঁর ''Economic History of India'' তে করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন যে, দেশের বর্ধমান অনগ্রসরতাকে ঠেকানো যেতে পারে কেবলমাত্র দ্রুত অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা, যা রূপায়িত হতে পারে, কেবলমাত্র একটি স্বাধীন সরকার দ্বারাই। পুঁজিপতি শ্রেণিও ত্র(মশ তাঁদের বেনীয়ানী চরিত্র ঝেড়ে ফেলে, ঔপনিবেশিক বাণিজ্য নীতি রোধ করতে একত্রিত হল। তাঁরা ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের তীব্র বিরোধিতা করে জাতীয় সরকারের কাছে Protection চাইল। ১৯৪০ সালের মধ্যে বহু ভারতীয় শিল্পপতি ব্রিটিশ বিনিয়োগের বি(দ্ধে দাবি জানালো।

শেষে Bipan Chandra এর ''Modern India'' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, ''It was as a result of the intrinsic nature of foreign imperialism and at its harmful impact on the lives of the Indian People that a powerful anti imperialist movement gradually arose and developed in India. This movement was a national movement becuse it united people from different classes and sections of the Society who Sank their mutual difference to Unite against the Common enemy.''

# একক ২ ❑ আদি কংগ্রেসের প্রকৃতি নীতি এবং কার্যত্র(ম

গঠন ঃ

২.১ আদি কংগ্রেসের প্রকৃতি নীতি এবং কার্যত্র(ম

২.২ আদি জাতীয়তাবাদীদের কার্যপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

২.৩ কংগ্রেসি কার্যপদ্ধতি

২.৪ কংগ্রেসি স্বাধীনতা সংকট ও উদারনীতির দ্বন্দ্ব

২.৫ গ্রন্থসূচি

## ২.১ আদি কংগ্রেসের প্রকৃতি নীতি এবং কার্যত্র(ম

১৮৮৫-এ প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর আদি জাতীয়তাবাদীদের নীতি ও কার্যত্র(ম সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, আমরা স্বীকার করব যে, কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে তথাকথিত ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে আধুনিক গবেষকরা দূর করেন। সন্দেহাতীতভাবে এই তত্ত্ব Allan Octavian Hume এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bannerjee) এর ভ্রান্তিমূলক বক্তব্যগুলির উপর গড়ে উঠেছে যে Hume, Dufferin-এর প্রত্য( নির্দেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনার জন্য কাজ করেছেন, যা কিনা জনগণের অসন্তুষ্টির বিপ( একটা ''Safery Value''। কংগ্রেসের গোঁড়া সমালোচকদের (R. P. Dutt এর মত) কাছে এই তত্ত্বের যথেষ্ট আবেদন ছিল তাই এল Conspiracy theory, সাম্প্রতিক গবেষকরা, বিশেষত ডাফরিনের নিজস্ব লেখার ভিত্তিতে, প্রমাণ করেন যে, উচ্চস্তরের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কেউ, হিউমের জনরোষ বা অসন্তুষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণীকে গু(ত্ব দেননি। ''হিউম 1885 এর মে মাসে সিমলায় ডাফরিনের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু ভাইসরয়ের মুখ্য এবং তাৎ( ণিক প্রতিত্রি(য়া ছিল, বোম্বাই এর গভর্নরকে উপদেশ (নির্দেশ) দেওয়া যে তিনি যেন প্রস্তাবিত ''প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সম্মেলন (Dufferin to Reay, 17 May 1995) থেকে দূরে থাকেন। যাই হোক, সমস্ত কথাই হিউমের ব্যক্তি(গত ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখাচ্ছে।

আদি জাতীয়তাবাদীদের এইসব নীতি এবং কার্যত্র(ম এক কথায় নরমপন্থী দশা (১৮৮৫-১৯০৫) হিসাবে সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে। এই ধারণার পিছনে কিছু সত্য আছে ''Certainly a broad uniformity in objectives and methods of activity Seems fairly obvious over the entire period.'' এই সময়ের কংগ্রেস বছরে তিন দিন মিলিত হত যখন সভাপতি এবং অন্যান্য প্রতিনিধির ভাষণ ইংরেজিতে দেওয়া হত এবং তিনটি প্রসারিত আভিযোগ( ত্র যথা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক (ে ত্রের উপর একই রকম প্রস্তাব গৃহীত হত। যদিও ''আদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বি(্বাস করতেন, যে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি(র জন্য প্রত্য( সংগ্রাম, এখনও ইতিহাসের আলোচ্যসূচিতে নেই। যা আছে তাহল জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা এবং তাকে সুদৃঢ় করা। এ সম্পর্কিত প্রথম গু(ত্বপূর্ণ কাজ হল— রাজনৈতিক প্র(্নে জনমানসে ঔৎসুক্য সৃষ্টি এবং দেশে জনমতকে সংগঠিত করা।'' অধ্যাপক সুমিত সরকার নরমপন্থী জমানার তিনটি পৃথক দশা চিহ্নি(ত করেছেন। প্রথম দশা ১৮৯২ পর্যন্ত চলেছে, যখন কংগ্রেস ছিল সাধারণ সম্পাদক হিসাবে হিউম দ্বারা প্রভাবিত। ''Erratic,

Platernalistic and domineering, his presence did impart a Certain dynamism which was to be Conspicuously absent in the succeeding years.'' কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা প্রথম পাঁচ বছরে দ্রুত বাড়তে লাগল, এবং Washbrook এবং Bayly-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৮৮৭ (Madras) এবং ১৮৮৮ (Allahabad) এর কংগ্রেস সম্মেলন ছিল ''unusually broad based'', ১৮৯২ তে hume ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার পর কংগ্রেসের দ্বিতীয় পর্যায় শু( হল। এই সময় থেকে প্রায় ১৮৯০ পর্যন্ত কংগ্রেস একটা স্থির অবস্থায় ছিল। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ চার্লু এবং ফিরোজশাহ মেহতার মতো কয়েকজনের একটা গোষ্ঠী সবরকম সিদ্ধান্ত নিতেন এবং পশ্চাতপটে রানাডে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতেন। কিন্তু ১৮৯৯ সাল থেকে, যখন মেহতা কংগ্রেস সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী ছিলেন এবং দলে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন, তখনই দলে নেতৃত্বের আবির্ভাব হল। অন্য কোনো সর্বসম্মত পরিবর্ত Substitute না থাকায় Hume-ই কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে রইলেন যদিও তিনি তখন এদেশে ছিলেন না। সেই দিনগুলিতে ভারতে নেতৃত্বের অভাবে কংগ্রেসের প্রচার, ইংল্যান্ডে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির মাধ্যমে চলতে থাকল, যা পরিচালিত হত Weddenburn, Hume এবং Naoroji দ্বারা এবং তাঁদের মুখপত্র ছিল ''India'' পত্রিকাটি। আদি কংগ্রেসের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হল কার্জনের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী নীতির প্রতিত্রি(য়া হিসাবে। এই সময়ে কংগ্রেসে নতুন সত্রি(য়তা এল Gokhale' এর নেতৃত্বে যাঁর ছিল আকর্ষণীয় ব্যক্তি(ত্ব, যৌবনের উচ্ছলতা, সন্দেহাতীত আত্মোৎসর্গ এবং সর্বসময়ের জন্য জনসেবা।

## ২.২ আদি জাতীয়তাবাদীদের কার্যপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

সম্ভবত, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনাই ছিল আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কার্যত্র(মের সর্বাপে(া গু(ত্বপূর্ণ অংশ। আদি জাতীয়তাবাদীরা বার বার ভারতের বর্ধমান দারিদ্রের কথা লিখেছেন এবং বলেছেন এবং এর কারণ হিসাবে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণকে দেখিয়েছেন। এই প্রতিবাদীদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি লিখেছেন যে, ব্রিটিশ শাসন হল, ''An everlasting, in creasing and everyday increasing foreign invasion'', যা কিনা, ''Utterly though gradually, destroying the Country''. আদি জাতীয়তাবাদীরা বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন সেইসব অর্থনৈতিক নীতিকে যা কিনা, ভারতের ঐতিহ্যশালী হস্তশিল্পকে ধ্বংস করছে এবং আধুনিক শিল্পের উন্নতির পথে প্রধান বাধা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এইসব মতামত আদি কংগ্রেসের কার্যত্র(মে, প্রতিফলিত হয়েছে। ''The economic issues raised were all bound up with the general poverty of India-drain of wealth theme.'' বার বার, সিদ্ধান্ত, গৃহীত হয়েছে যে, ভারতের দারিদ্র এবং দুর্ভি( সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে, অভিবাসী ইংরেজদের ভাতা এবং প্রতির(া খাতে খরচ কমাতে হবে, শিল্পে অগ্রগতির স্বার্থে টেকনিক্যাল শি(াতে আরও অর্থবরাদ্দ করতে হবে এবং পণ্যের মূল্য এবং আবগারি ট্যাক্স কমাতে হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রত্য( ফল হিসাবে, অতিরিক্ত( জমির খাজনার দায়ে চাষিরা জমি বিত্রি( করতে বাধ্য হচ্ছে। আদি কংগ্রেস যে কেবলমাত্র ইংরেজি-শি(িত গোষ্ঠী, জমিদার বা শিল্পপতিদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত নয়, তা বোঝা যায় তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি থেকে, যাতে লবণ-কর, বিদেশে নিযুক্ত( ভারতীয় শ্রমজীবী এবং বন-প্রশাসনকৃত আদিবাসীদের কষ্ট ভোগের উপর বলা হয়েছে।

আদি জাতীয়তাবাদীদের অন্য দাবিও ছিল সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার যা এইসময় বাঞ্ছিত ছিল, তা

হল উচ্চ প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের নিয়োগ যা, রাজনীতিগত, অর্থনৈতিক বা নীতিগত দিক দিয়ে জ(রি। প্রচলিত ব্যবস্থায় ICS পদে ইউরোপীয়দের অধিকতর ভাতায় নিয়োগের ফলে, ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ব্যয়বহুল করে তুলছিল। একই যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের নিয়োগ অনেক কম ভাতায় সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনে নিযুক্ত( ইউরোপীয়দের ভাতা এবং পেনসন পুরোটাই ভারতের বাইরে চলে যেত। ''Politically, the nationalists hoped that in Indianisation of these services would make the administration more responsive to Indian, needs'' এই সব প্রশাসনিক পরিবর্তন ভারতবাসীর প্রয়োজনে অধিকতর সাড়া দিতে পারবে। নীতিগতভাবে, এর ফল অনুভূত হচ্ছিল, যা গোখলের ভাষায়, ''a kind of dwarfing or Spenting of the Indian race'' ''in an atmosphere of inferiority.'' অর্থাৎ ভারতীয়দের জাতি হিসাবে ছোটো করে, একটা হীনমন্যতার বাতাবরণ সৃষ্টি করবে। তাই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ভারতীয়দের দ্বারা চালিত করার দাবি উঠল, যা, ''raised not really just to satisfy the tiny elite who could hope to get into the ICS, as has been sometimes argued, but Connected with much broader themes''.

আদি জাতীয়তাবাদীদের আরও কতকগুলি প্রশাসনিক দাবি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনের পৃথকীকরণ দাবি করল এবং জুরিদের (মতা খর্ব করার সমালোচনা করল। তাঁরা আরও দাবি করলেন যে রাষ্ট্রের সেবামূলক দিকে (welfare activities) যেমন প্রাথমিক শি(ার প্রসার, কারিগরি এবং উচ্চ শি(ায় বিস্তারের সুযোগকে আরও প্রসারিত করতে হবে। তাঁরা চাইলেন কৃষি-ব্যাঙ্ক (Agricultural banks), সেচব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত( কর্মসূচি, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উন্নততর পুলিশি ব্যবস্থা। তা ছাড়াও, যে সব ভারতীয় শ্রমিক দারিদ্রের জন্য দ(িণ আফ্রিকা, মালয়, মরিশাস, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রিটিশ গিয়ানায় কাজ নিয়ে যাচ্ছে তাদের সুর(ার জন্য এবং তাদের সপ(ে দাবি তুললেন।

''প্রথম থেকেই আদি জাতীয়তাবাদীরা বি(্বাস করতেন যে কালত্র(মে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক স্বশাসনের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তাঁরা অবিলম্বে এই উদ্দেশ্যে কোনো দাবি করলেন না। পরিবর্তে তাঁরা ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে স্বাধীনতা লাভের পথ অনুসরণ করলেন। তাঁদের তাৎ(ণিক রাজনৈতিক দাবিগুলো ছিল অত্যন্ত মৃদু। প্রারম্ভে তাঁরা চাইলেন যে, বর্তমান Legislative Council এবং সংশোধন এবং প্রসারণ করে তাতে ভারতীয়দের অধিকতর অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে। ১৯৬১ সালের ভারতীয় Councils act'এ কয়েকজন (non-officials) ভারতীয়ের মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা হল, এইসব সরকারি মনোনীতরা ছিলেন সাধারণত জমিদার বা বড় ব্যবসায়ী, যাঁরা সম্পূর্ণভাবে সরকারি নীতিকেই সমর্থন করতেন। যেমন, 1888 সালে, তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে লবণ কর বৃদ্ধিকে সমর্থন জানান। কংগ্রেস মঞ্চে তাঁদেরকে উপহাসের সঙ্গে বর্ণনা করা হত, 'gilded shams' (নকলসোনা) এবং ''magnificent non-entities'' (জমকালো অস্তিত্বহীন)। জাতীয়তাবাদীরা দাবি করলেন যে কাউন্সিলের (মতা বাড়াতে হবে এবং সদস্যদের বাজেট এবং দৈনন্দিন প্রশাসনের সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ দাবি হল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাউন্সিলে সদস্যভুক্ত( করতে হবে।

''জনগণের চাপে সরকার ১৮৯২ সালে নতুন ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রবর্তন করলেন। এই অ্যাকটে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো হল, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে অপ্রত্য(ভাবে নির্বাচিত হতে হবে, সদস্যদের বাজেট সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হল, যদিও বাজেটের ওপর ভোটের অধিকার দেওয়া হল না। এই সামান্য সংস্কার ভারতীয়দের অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করল। এর মধ্যে তাঁরা দেখলেন তাদের দাবিকে তামাসা করা হল। তারা তখন কাউন্সিলে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাগু(ত্ব (Elected Majority) চাইলেন এবং জনগণের সম্পদের উপর বেসরকারি ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার দাবি করলেন। তারা স্লোগান তুললেন : no taxation without representation, একই সময়ে তারা গণতান্ত্রিক দাবির ভিতকে প্রসারিত করতে ব্যর্থ হলেন। অর্থাৎ,

তারা জনগণের ভোটাধিকার বা মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবি করলেন না।'' (Chandra, Tripathi and De, Freedom Struggle.)

## ২.৩ কংগ্রেসি কার্যপদ্ধতি (The Congress Method)

আদি জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের রাজনৈতিক কাজে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তাকে অনেক সময়, ''ভি( াবৃত্তি'' বলা হত। আর, তাই তাঁদের, সমালোচকরা তাঁদেরকে বলতেন নরমপন্থী। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় ''The Political methods of the moderates can be summed up briefly as Constitutional agitation with in the four walls of the law, and slow, orderly Political Progress.'' তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতির উপর নির্ভর করতেন। প্রথমত তাঁরা সভা করতেন যেখানে বক্তৃ(তা হত, আর প্রস্তাব গৃহীত হত। দ্বিতীয়ত তাঁরা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা চালিয়ে যেতেন। তৃতীয়ত তাঁরা উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, স্মারক লিপি এবং দরখাস্ত পেশ করতেন। যেমন, জাস্টিস্ বানাডে বলেন, ''These memorials are nominally aiddressed to Government, in reality they are addressed to the people So that they may learn how to think in these matters'', এই সব পদ্ধতিই আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা এবং তাঁদের সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তিকেই নির্দেশ করে। আন্দোলনের আবেদন ছিল তখনও সীমাবদ্ধ ''In particular the leadership was Confined to professional groups Such as lowyers, doctors, Journalists & teachers, and a few merchants & landowners.''

আদি জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সরকারি ব্রিটিশদের ধারণার কিছু পরিবর্তন ল( ণীয়। প্রথম দিকে সরকারি ব্যক্তি(দের শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশ্যে আসেনি। এমনকি কেউ কেউ ভাবতেন যে হিউমের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের প( (তিকারক হবে না। একটি অনুষ্ঠানে (ডিসেম্বর ১৮৮৬) ভাইসরয় কংগ্রেস প্রতিনিধিদের তাঁর Garden Party' তে আমন্ত্রণও জানান। কিন্তু খুব শীঘ্রই বোঝা গেল যে জাতীয় কংগ্রেস শাসকের হাতের পুতুল না হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ প্রশাসকেরা প্রকাশ্যেই জাতীয় কংগ্রেসের এবং কিছু জাতীয়তাবাদী মুখপাত্রের সমালোচনা ও নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন। লর্ড ডাফরিন বললেন যে এটা ''microscopic minority''— এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং লর্ড কার্জন চাইলেন এটার ''Peaceful Demise'' এ সহায়তা করতে। ব্রিটিশ কর্তৃপ( , এমনকি, ব্রিটিশ অনুগামী কিছু ব্যক্তি(কে একটি কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করতে উৎসাহীত করতে লাগলেন।

আদি জাতীয়তাবাদীদের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। পরবর্তীকালে চরমপন্থী নেতা, লাজপৎ রায় বললেন ''After more than 20 years of more or less futile agitations for Concessions and redress of grievances. they had received stones in peace of bread.'' এই রাজনীতি ছিল ''halting and half hearted,'' এবং ভি( াবৃত্তির অনুসারী। তাঁদের বাস্তব সাফল্য ছিল অতি সামান্য। তাঁরা একটা সর্বভারতীয় সাংবিধানিক আন্দোলন সংগঠিত করতেও সফল হননি। তাঁদের জনসংযোগ ছিল না এবং ত(ণ প্রজন্ম তখনও তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হয়নি। তবু, নিক্তি(র ওজনে, আদি জাতীয়তাবাদীদের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর (''not all that bleak'') ছিল না। সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁদের কাজ করতে হত কঠিন অবস্থার মধ্যে, জাতীয় চেতনার মুখ্য সংগঠন হিসাবে, যখন সাম্রাজ্যবাদ ছিল মধ্য গগনে। বস্তুতপ( বৃহৎ অর্থে, তাঁদের এটাই হল সবচেয়ে বড়ো সাফল্য, যে পরবর্তীকালে বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলন তাঁদের জন্যই গড়ে উঠল তাঁদের আগের পথকে

ঐতিহাসিকভাবে বাতিল করে। তাঁদের সচেতন প্রয়াসেই সাধারণ রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ সম্মিলিত হল এবং সাম্রাজ্যবাদই যে জনগণের সাধারণ শত্রুতা' স্বীকৃত হল। বাস্তবিক, ''জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য জনপ্রিয় এবং জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সহযোগিতায় ভারতীয়রা গণতন্ত্রের ধারণা অর্জন করল, বিশেষত এমন একটা সময়ে যখন শাসকশ্রেণি সর্বদা তাঁদের বলত যে, তাঁরা কেবল সদাশয়তা বা পরোপকারেচ্ছু বা প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের উপযুক্ত( [ fit only for ''benevolent'' or ''oriental despotism.] তাছাড়াও, বহু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মী আধুনিক রাজনীতিতে শি( লাভ করল এবং জনগণ আধুনিক রাজনৈতিক ভাবনা ও তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হল।

## ২.৪ কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংকট উদারনীতির দ্বন্দ্ব

আদি জাতীয়তাবাদীদের পরিমাপ যাই হোক না কেন, এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না যে, ১৯০০ সাল পর্যন্ত তাঁরা জাতীয় অনুভূতির একটা (ুদ্র অংশকে প্রতিফলিত করত। দুর্ভি( এবং মহামারী, আমদানি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত( শুল্ক এবং কার্জনের আগ্রাসী নীতি, সারা দেশে ব্রিটিশকে ইতিমধ্যেই অপ্রিয় করে তুলেছে। ফলে, রাজনৈতিক ত্রি(য়াকলাপের ভিত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রচার যেখানে ১৮৮৫ এ ছিল ২৯৯০০০ তা' ১৯০৫ সালে হল ৮,১৭,০০০ বস্তুত কলকাতার বঙ্গ বাসী এবং পুণার কেসরি এবং কাল কংগ্রেস ত্রি(য়াকর্ম সম্পর্কে উচ্চ সমালোচনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গি জাতীয়তাবাদ জন্ম নিল।

কেমব্রিজের ঐতিহাসিকগণ, অবশ্য ভারতে জঙ্গি আন্দোলন সম্পর্কে ভিন্ন মতবাদ পোষণ করে। তাঁদের মতে, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দলের মধ্যে যে ভোটের সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফল হল জঙ্গিবাদ (Extremism)। এটা সত্য যে ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে, কংগ্রেসে যথেষ্ট অন্তর্দলীয় সত্রি(য়তা ছিল। এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রথমত, সুরেন্দ্রনাথ এর ''বাঙ্গালী'' মতিলাল ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্যে সবসময় একটা কোঁদল লেগেই থাকত। দ্বিতীয় ''facionalism was Particularly acute in the Punjab, with the three groups with in the Lahore Brahmo Samaj,'' যা কিনা আর্যসমাজে একটা বড়ো ভাঙন এবং হর কিষাণ এবং লালা লাজপৎ রাও-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব। তৃতীয়ত ''Mylapore Clique',-এর ''Egmore rivals'' এর মফস্সল ''Outs''দের মধ্যে ছিল একটি ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব, যেমন Wash brook দেখিয়েছেন। চতুর্থত Deccan Education Society-এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে Agarkar এবং Gokhale'র মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কেমব্রিজের ইতিহাসবিদদের মতে, এইসব দ্বন্দ্ব ''Had little to do initialty with differences on political or even Social reform issues'', এগুলো কেবলমাত্রই অন্তর্দলীয় কোঁদল।

এই কেমব্রিজ দৃষ্টিভঙ্গি, নানা দিক দিয়ে প্র(্নের সম্মুখীন হতে পারে। প্রথমত কংগ্রেস তখনও যথেষ্ট সম্পদশালী, বাহ্যিক সমর্থনপুষ্ট এবং প্রকৃত রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠেনি। ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে কংগ্রেস রাজনীতির সত্রী(য় সমালোচক ছিল, বাংলা, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রে। ''The Starting point of the new approach was a two-fold Critique of the moderate Congress for its 'mendilant' technique of appealing to British Public opinion, flet to be both futile and dishonourable and for its being no more than a movement of an English-educated elite alienated from the Common people'' খুব তাড়াতাড়ি,

নরমপন্থী রাজনীতির বি(দ্ধে সাধারণ প্রতিত্রি(য়া তিনটি রূপ নিল যার প্রতিটি অতি (ুদ্র রূপে (in germ) ১৮৯০ সাল নাগাদ দেখা গেল। প্রথম রূপটি হল বিদেশি শাসনকে প্রত্য( আঘাত না করে, আত্মোন্নতির অ-রাজনৈতিক ঝোঁকে। দ্বিতীয়ত, মূলত নিশ্(ীয় প্রতিরোধের মাধ্যমে পূর্ণ স্বরাজলাভের জন্য চরমপন্থী রাজনীতি জন্ম নিল। তৃতীয়ত, প্রতিত্রি(য়া রূপ নিল বিপ্-বী সন্ত্রাসবাদের যা ছিল স্বাধীনতা লাভের সর্বাপে(া Shortcut।

এখানে উল্লেখ করা গু(ত্বপূর্ণ যে, সবচেয়ে বাঙ্ময় সমালোচনা, নরমপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে করত আদি জঙ্গি জাতীয়তাবাদীরা। ১৮৯৩-৯৪ সালে প্রথম সুসংবদ্ধ সমালোচনা এল, অরবিন্দ ঘোষের লেখা New lamps for old থেকে, যাতে আহ্বান জানান হল ''bugess or the middle clan'' এবং ''the proletariat'' এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। অর্থাৎ শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। তিনি বরোদা থেকে তাঁর দুজন দূত যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী এবং রবীন্দ্র কুমার ঘোষকে বাংলায় পাঠান। দ্বিতীয়ত ১৮৯৭ সালের কাছাকাছি সময়ে বাংলায় কংগ্রেসি কাজকর্মকে অশ্বিনীকুমার দত্ত ''তিন দিনের তামাশা'' বলে উল্লেখ করেন। ''দত্ত ছিলেন বরিশালের একজন স্কুল শি( ক যিনি তাঁর সারাজীবন সামাজিক কাজের মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব জনতা তৈরি করলেন যা তাঁর অঞ্চলকে স্বদেশি আন্দোলনের একটা শত্ত( ঘাঁটিতে পরিণত করে ১৯০৫ সালের দিনগুলিতে''। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর পুনঃপুনঃ ''আত্মশত্তি(-র'' আহ্বান স্বদেশি পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে এই সমালোচনায় যোগ দেন। চতুর্থত কিছু অন্য বিশেষ ব্যত্তি(ত্ব এই সমালোচনায় অংশীদার ছিলেন। বিবেকানন্দের বাণী সিস্টার নিবেদিতার মাধ্যমে একটা প্রত্য( রাজনৈতিক বর্ণ নিয়ে এল, যাঁর আইরিশ এবং অন্যান্য বিপ্-বী আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্য( ধারণা ছিল। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, তাঁর Bengal Chemicals (১৮৯৩তে প্রতিষ্ঠিত) এর মাধ্যমে এবং সতীশ মুখার্জী তাঁর ''Dawn Society'' এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ দেশজ নিয়ন্ত্রণে শি(ার নব্য রূপ সম্পর্কে পরী(ানিরী(া করছিলেন, পঞ্চমত, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রাই ১৯০১ এর Kayastha Samachar পত্রিকা দুটি নিবন্ধে (article) টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং শিল্পে স্বনির্ভরতা সম্পর্কে উপদেশ দেন। সেখানে Harkishan Lal গোষ্ঠী এবং আর্যসমাজীরা ১৮৯০ সাল থেকেই 'স্বদেশি' শিল্পে এবং বিনিয়োগে সত্রি(য় ছিলেন। অবশেষে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর তীব্র এবং সর্বাঙ্গীণ প্রচারে নরমপন্থী রাজনীতির বি(দ্ধে চরমপন্থী আন্দোলনের আগুন জ্বাললেন।

নরমপন্থী এবং চরমপন্থীরা প্রকৃতপ( নামেই ভিন্ন। চারের নরমপন্থীরাই তাঁদের সময়ে চরমপন্থী, তাঁরা ব্রিটিশ সিংহকে ভয় দেখাতে যে কাজ করতেন তাই পরে ভি(ার রাজনীতি নামে উল্লিখিত হয়েছিল। নওরোজীর সংখ্যাতত্ত্ব প্রমাণ করেছিল যে নিঃসন্দেহে ভারতের দারিদ্রের মূল কারণ ব্রিটিশের উপস্থিতি।

চরমপন্থীদের মনে হতে পারে নরমপন্থী যা পরবর্তী বিপ্-বী আন্দোলনের পরিপ্রে(িতে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁরাই প্রথম ''Purno Swaraj'' বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প( দাবি করেন। তাঁদের নিম্নমধ্যবিত্ত চরিত্র এঁকে তাঁদের চরিত্র হনন উচিত নয়।

এই প্রচারে বাল গঙ্গাধর তিলক ধর্মীয় গোঁড়ামীকে, জনসংযোগের একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করেন। তিনি মহারাষ্ট্র শিবাজি উৎসব এর মত উৎসব পালনের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক ভত্তি(বাদ এর উন্নয়নে সাহায্য করেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে কর না দেওয়ার জন্য প্রচার আরম্ভ করেন এবং চালনা করেন। ১৮৯০ সালের আবগারি শুল্কের বি(দ্ধে তাঁর প্রচারকে পরবর্তীকালের বয়কট আন্দোলনের উৎস হিসাবে ধরা যায়। এইসব ত্রি(য়াকর্মের ফলেই দেশে বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৮৯৭ সালে পুণার বিপ্-বী সন্ত্রাসকে কেবলই সমাপতন হিসাবে ধরা যায় না। যাতে Rand এবং Ayerst চাপেকার ভাইদের দ্বারা, ব্রিটিশদের পুনা প্-েগের প্রতিকারে ব্যর্থতার জন্য, প্রতিবাদ হিসাবে নিহত হন।

## ২.৫ গ্রন্থপঞ্জী


Sumit Sarkar : Modern India, New Delhi, 1983.

Bipan Chandra : Modern India, NCERT, New Delhi, 1982.

Bipan Chandra & Others : India's Strugle for in dependence, Penguin, 1989.

Shekhar Bandyopadhyay : From Plassey to Partition, New Delhi, 2004.

C.A.Bayly : The Local Roots of Indian Politics, Oxford, 1975.

Sujata Bose, Ayesha Jalal : Modern South Asia-History, Culture, Political Economy, London, 1998.

J.R. Mc. Iane : Indian Nationalism and the Early Congress, Princeton, 1977.

Ashis Nandy : The Illegitimacy of Nationalism — Rabindranath Tagore and the Politics of Self, Delhi, 1994.

D. Argov : The moderates and the Extremists, Bombay, 1987.

# একক ৩ ❑ সাম্প্রদায়িকতা উত্থান এবং বৃদ্ধি

গঠন ঃ

৩.১ সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং বৃদ্ধি

৩.২ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

৩.৩ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি

৩.৪ গ্রন্থসূচি

## ৩.১ সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং বৃদ্ধি

যদি জাতীয়তাবাদ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়, তবে অপরটি হল সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা বলতে এখানে বোঝাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণিগত সচেতনতা, যা কিনা ঔপনিবেশিকতার মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ পেল। ''এই অত্যন্ত জটিল বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা বাধা পেয়েছে বিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট দুটি বাধাধরা বিপরীত ধারণার মাধ্যমে— হিন্দু ও মুসলমানদের দুটি বিরোধী জাতি— যাঁরা মধ্যযুগ থেকে ভিন্ন জাতি হিসাবে বর্তমান এবং বিপরীত দিকে জাতীয়তাবাদী ভিন্ন Myth যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সুবর্ণযুগ যা ব্রিটিশের 'divide and rule' নীতি দ্বারা ভেঙে গেল। এর ফলে ভারতে প্রাচীন, মধ্য এবং বর্তমান যুগের উপর লিখিত ইতিহাস বইগুলি সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। তবে অতি সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এটাই বলে যে, ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার আগে, বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে টানাপোড়েন ছিল ঠিকই, কিন্তু এই টানাপোড়েন কখনই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মাত্রা পায়নি, যতদিন না পর্যন্ত চতুর ব্রিটিশ নীতি এটাকে সমর্থন এবং লালন করেছে। কিছু স্থানীয় বিবাদ এবং আন্তঃ ও অন্তঃ সম্প্রদায়গত বিবাদ ছিল, তথাপি, ''Communal riots do Seem to have been significantly rare down to the 1880s.''

কী ছিল এই ব্রিটিশ নীতি? এটা সর্বজন বিদিত যে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে মুসলিম এবং হিন্দুরা একসঙ্গে লড়াই করেছে। ব্রিটিশ মুসলিমদের উপর বিশেষভাবে প্রতিশোধমূলক মনোভাব নিয়ে প্রায় 27,000 মুসলিমকে কেবলমাত্র দিল্লিতেই ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকেই সাধারণভাবে মুসলিমদের ব্রিটিশ সন্দেহের চোখে দেখত। ১৮৭০ সাল থেকে ব্রিটিশের নীতির পরিবর্তন ঘটল বর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুস্থিতি এবং সুর(ার স্বার্থে বুদ্ধিমান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতারা এই আন্দোলনকে নিরস্ত করতে চাইলেন। আর তখনই এল ''divide and rule'' নীতি অর্থাৎ ভারতীয় জনগণকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে, তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদমূলক প্রবণতায় উৎসাহ দান, ব্রিটিশ দাবি করল যে তারা সংখ্যালঘু মুসলিমদের উদ্ধারকর্তা এবং মুসলিম জমিদার, জোতদার এবং শি(িত মধ্যবিত্তদের চিত্ত জয়ে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাল। তারা অন্যান্য বিভেদমূলক পন্থা গ্রহণ করল। তারা প্রাদেশিকতাতেও উৎসাহ দিল। ভারতীয় সমাজে জাতিভেদকেও তারা কাজে লাগাতে চেষ্টা করল, ব্রাহ্মণের বি(দ্ধে অব্রাহ্মণকে এবং উচ্চবর্ণের বি(দ্ধে

নিম্নবর্ণকে। U.P এবং বিহারে আদালতে উর্দুর বদলে হিন্দি চালু করে। তারা সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক তিক্ত(তা সৃষ্টি করল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। এখানে উল্লেখ করা গু(ত্বপূর্ণ যে Divide and Rule নীতিতে, ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের নানান ন্যায্য দাবিকেও বিভেদ সৃষ্টির কাজে লাগানো হল। এতে আলোকপ্রাপ্ত সাম্প্রদায়িকতার একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল।'' কিন্তু যে মর্মান্তিক ঘটনা এখানে স্বীকার করতে হবে, তা হল, সাম্প্রদায়িকতা একটা বিরাট আকার নিয়েছিল অনেক আগেই— যদিও এটা স্পষ্টতই আলোক প্রাপ্ত শ্রেণির ত্রি(য়াকলাপের সঙ্গে অসম্পর্কিত ছিল না। যেমন, পাবনা riot বা Moplah এর ঘটনা তেমন বিস্তৃতভাবে ঘটেনি কারণ এ( ত্রে বিভেদকারী বুদ্ধিজীবীশ্রেণি নেতৃত্ব দেয় নি (বাংলা বা মালাবারে)। কিন্তু U.P. এবং Punjab এ হিন্দু মুসলিম আলোকপ্রাপ্তরা প্রায় সমান হওয়ায়, দেশের এই অংশে দাঙ্গা ১৮৮০ সালের পর থেকে ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েন হয়তো অংশত এর জন্য দায়ি। যেমন, অযোধ্যার বিস্তৃর্ণ অংশে এবং আলিগড় বুলন্দসর অঞ্চলে, অধিকাংশ চাষি হিন্দু কিন্তু তালুকদার এবং জমিদাররা মুসলমান। আবার উত্তরপ্রদেশে শহরাঞ্চলে অধিকাংশ মুসলিমই হল শ্রমিক, দোকানদার বা ছোটো ব্যবসায়ী। অপরপ( বড়ো ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কার ছিল হিন্দু। পাঞ্জাবে হিন্দু ব্যবসায়ী এবং মহাজন (কুসিদজীবী) ছিল মুসলিম চাষিদের বিরাগভাজন।''

## ৩.২ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

যে ব্যক্তি( ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনি স্যার সৈয়দ আমেদ খান (১৮১৭-৯৮)। তিনি ছিলেন একজন বড়ো শি( াবিদ এবং সমাজসংস্কারক। তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি কোরানের বাণীর সং(-যণে সচেষ্ট ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি গোঁড়া মুসলিম নেতাদের সঙ্গে রাখেন। এই পর্যায়ে তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের গভীর সহযোগিতায় বি(্বাস করতেন। তিনি আলিগড়ে Mohammedan Anglo-Orintal College প্রতিষ্ঠার সময় উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই 'donation' নেন। এমনকি 1884 সালে তিনি বলেন—''মনে রাখবেন যে হিন্দু এবং মহম্মদীয় দুটি শব্দ কেবলমাত্র ধর্মীয় পার্থক্য নির্দেশ করে( তাছাড়া, সব মানুষ হিন্দু বা মহম্মদীয় এমনকি খিস্টীয়, যাঁরাই এদেশে বাস করেন, তাঁরা সকলেই একই জাতি (nation)। এবং একই জাতি হিসাবে, তাঁরা সকলে সম্মিলিতভাবে দেশের হিতের জন্য কাজ করবে। দুর্ভাগ্যত্র(মে, স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের এই প্রাথমিক আলোকপ্রাপ্ত দশা অত্যন্ত ( ণস্থায়ী ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, তিনি ভারতে মুসলিমদের অবস্থান বুঝতে পারলেন। তিনি বিশেষত র( ণশীল মুসলিম জমিদারদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এবং ব্রিটিশ নীতির মদতে ঘোষণা করলেন যে হিন্দু ও মুসলিমদের রাজনৈতিক স্বার্থ এক নয় বরং বিভিন্ন দিক অভিসারী। ''তিনি একান্তভাবে অনুগত (ব্রিটিশ অনুগত) ছিলেন এবং যখন ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল (১৮৮৫) তিনি এর বিরোধী ছিলেন এবং বেনারসের রাজা শিবপ্রসাদকে নিয়ে একটি বি(দ্ধ আন্দোলেনের আয়োজন করলেন যাতে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়া হল। তিনি তাঁর অনুসারীদের বললেন যে, যদি ব্রিটিশ এদেশ ছাড়ে, তবে হিন্দু সংখ্যাগু( প্রাধান্যলাভ করবে এবং মুসিলম সংখ্যালঘুদের প্রতি খারাপ আচরণ করবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে, মুসলিমদের যোগ না দিতে তিনি উপদেশ দিলেন। যদিও অন্যান্য মুসলিম নেতা যেমন বদ(দ্দিন তায়েবজি আবেদন জানালেন নতুন জাতীয়সংস্থায় যোগ দিতে।

## ৩.৩ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি

কীভাবে সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদপন্থী প্রবণতা মুসলিমদের মধ্যে বৃদ্ধি পেল? এর অনেকগুলো কারণ— স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের ব্যক্তি(গত আবেদন ছাড়াও অনেক বৃহত্তর কারণ এর জন্য দায়ী। প্রথমত, আধুনিক শি(া, বাণিজ্য এবং শিল্পে, হিন্দুদের থেকে মুসলিমরা অপে(াকৃত পশ্চাৎপদ থাকায় সমাজে একটা ভারসাম্যহীনতা ছিল। যেহেতু উচ্চ শ্রেণির মুসলমান জমিদার এবং অভিজাত শ্রেণি ছিল র(ণশীল এবং উচ্চ শি(ার বিরোধী, তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজে উচ্চশি(ার প্রসার ঘটেনি। ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য শি(া যা বিজ্ঞান, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের উপর জোর দিয়েছিল, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিস্তৃত না হওয়ায় তাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এবং পশ্চাৎপদ হয়েছিল। পরে সৈয়দ আহমেদ খান, নবাব আবদুল লতিফ, বদ(দ্দিন তায়েবজী এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাদের চেষ্টায় আধুনিক শি(া মুসলিমদের মধ্যে প্রসার লাভ করল। কিন্তু আনুপাতিক হারে হিন্দু, পারসি এবং খ্রিস্টানদের তুলনায় মুসলিম শি(িতদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। একইরূপে, শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসারে মুসলমানরা খুব কমই অংশ নিয়েছিল। শি(িত মানুষ, শিল্পপতি এবং বণিক শ্রেণির স্বল্প সংখ্যার জন্য— প্রতিত্রি(য়াশীল জমিদার শ্রেণি তাদের প্রভাব মুসলিম জনগণের উপর খাটিয়ে যেতে লাগল। হিন্দুদের (ে ত্রে ঘটল এর বিপরীত। যাদের মধ্যে জমিদার শ্রেণির নেতৃত্বকে সরিয়ে পেশাদার এবং শিল্পপতি শ্রেণি নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হল। দ্বিতীয়ত, শি(ায় পশ্চাদপদ হওয়ার জন্য তাঁরা অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যায় সরকারি চাকরি এবং বিভিন্ন পেশায় প্রবেশ করতে পেরেছেন। তাই ঔপনিবেশিক ভারতে অত্যন্ত উচ্চ প্রতিযোগিতার মধ্যে তাঁরা কর্মের সুযোগ কমই পেয়েছেন। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ অফিসিয়াল এবং অনুগত মুসলিম নেতৃত্ব সহজেই শি(িত হিন্দুদের বি(দ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করতে পেরেছেন। আর তাই তাঁরা মুসলিমদের জন্য সরকারি পদে বিশেষ ব্যবস্থা চাইল। ''তাই যেখানে দেশে স্বাধীন ও জাতীয়তাবাদী উকিল, সাংবাদিক, ছাত্রসমাজ, বণিকশ্রেণি এবং শিল্পপতিরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসছিল, মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ অনুগত জমিদার এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা তখনও নৈতিক মতকে প্রভাবিত করছিল। একমাত্র ব্যতিত্র(ম ছিল Mombay যেখানে বদ(দ্দিন তায়েবজি, R.M. Sayani, A, Bhimji এবং নবীন ব্যারিস্টার মুহম্মদ আলি জিন্নাই ছিলেন প্রধান। তৃতীয়ত ভারতীয় ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক অভিমুখ, যাতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতিকে একেবারেই পৃথক করে দেখানো হয়েছে, যা কিনা এটি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, বিভেদমূলক প্রবণতাকে (হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে) উৎসাহিত করেছে।

মুসলিম সমস্যার প্রতি হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মনোভাবও কয়েক বছর ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভীতি এবং শঙ্কার প্রতি আদি জাতীয়তাবাদীরা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। ''তাই তাঁরা সংখ্যালঘুদের বোঝাতে লাগলেন, যে জাতীয় আন্দোলন তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার র(া করবেন, এবং সমস্ত ভারতবাসীকে সাধারণ জাতীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থে একত্রিত করবেন। ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে— দাদাভাই পরিষ্কার আ(াস দেন যে, কংগ্রেস কেবলমাত্র জাতীয় বিষয়গুলিই গ্রহণ করবে এবং ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়গুলো নয়। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেস এই নীতি গ্রহণ করল যে, তাঁরা এমন কোনো প্রস্তাব নেবেন না যা কিনা মুসলিমদের প(ে (তিকারক। বহু মুসলিম কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসে যোগ দেয়। অর্থাৎ কিনা, আদি জাতীয়তাবাদীরা জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে যথেষ্ট আধুনিক করতে চেষ্টা করেছিল, তাঁদেরকে এই শি(া দিয়ে যে, ধর্ম এবং সম্প্রদায় কখনই রাজনীতির ভিত্তি হওয়ায় উচিত নয়।

জঙ্গি জাতীয়তাবাদের সময়ে, অবশ্য, জাতীয় একতার বৃদ্ধির সাপে(ে একটা মন্দন এল। জঙ্গি জাতীয়তাবাদীদের কাজ এবং ভাবনায় একটা ধর্মীয় প্রবণতা (হিন্দুধর্ম) থেকেই এটা সৃষ্ট হল। অধিকাংশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদী ভারতীয়

সংস্কৃতি এবং ভারতীয় জাতিকে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুদের বলে চিহ্নি(ত করল। ''উদাহরণস্বরূপ, তিলকের শিবাজি এবং গণপতি উৎসব, অরবিন্দের ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে বন্দনা এবং জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসাবে দেখা, কালীমাতার সামনে জঙ্গি আন্দোলনকারীদের শপথ গ্রহণ এবং দেশভাগ বিরোধী আন্দোলনের প্রারম্ভে গঙ্গায় ডুব দেওয়া, ইত্যাদির কোনো আবদেন মুসলিমদের কাছে ছিল না।'' তবে, অধিকাংশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মুসলিম বিরোধী বা সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিলকের মতো, অনেকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে সমর্থন করতেন। অধিকন্তু, তাঁদের কোনো কোনো ধারণা, যেমন ভারতমাতা— ছিল আধুনিক, ''being in no way linked to religion,'' তবু, সব মিলিয়ে, জঙ্গি জাতীয়তাবাদীদের হিন্দু ধর্মের প্রতি ঝোঁককে উপে(া করা যায় না এবং তাই শি(িত মুসলিমদের একটা বড়ো অংশ জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রইল এবং সহজেই বিভেদপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হল।

অবশেষে, দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাও সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে অপ্রতুল শিল্পোন্নতির জন্য শি(িত যুবকদের বেকারত্ব একটি গভীর সমস্যা হয়ে রইল। সীমিত সংখ্যক চাকরির জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রোগের কারণ ঠিকমতো নির্ণয় করার পরিবর্তে অনেকেই আপাত প্রতিকারের কথা চিন্তা করল— সাম্প্রদায়িক, দেশজ (Provincial) এবং জাতির ভিত্তিতে চাকরিতে সংর(ণ। আর একটু এগিয়ে বললে, বলা যায়, 'বহু হিন্দু বলতে আরম্ভ করল হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বহু মুসলমান, মুসলিম জাতীয়তাবাদের কথা।''

শি(িত মুসলিমদের মধ্যে এইসব সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদপন্থী প্রবণতার সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ ফল ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের পত্তন হল Aga Khan, ঢাকার নবাব এবং নবাব মোহসিন-উল মূলক-এর নেতৃত্বে। 1906 সালের পয়লা অক্টোবর সিমলাতে Lord Minto'র কাছে এক স্মারকলিপিতে আলিগড়বাসী মুসলিম আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত( প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাল কারণ সাম্রাজ্যের র(ার জন্য তাদের অবদান। মুসলিম লিগ এইসময় বঙ্গ বিভাগকে সমর্থন করল, সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য বিশেষ র(াকবচ দাবি করল এবং ভাইসরয়ের কাছ থেকে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মতি আদায় করল। ত্র(মবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনকে খর্ব করার জন্য ব্রিটিশের হাতে লিগ হল প্রধান অস্ত্র। মুসলিম লিগের প্রসংশাকারীরা জাতীয়তাবাদীদের (এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের) এই দোষারোপকে ত্রে(াধমিশ্রিত ঘৃণার সঙ্গে অপমান করার চেষ্টা করত যে, সমস্ত আন্দোলন (লিগের), টাই, ব্রিটিশ দ্বারা আয়োজিত এবং Command Performance'' এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। (মহম্মদ আলি 1923 সালে কাকিনাড়া কংগ্রেস সিমলা প্রতিনিধিবর্গের সম্পর্কে প্রায়ই এই কথাটি প্রয়োগ করতেন)। 1880 সাল থেকে সৈদয় আহমেদ গোষ্ঠী মুসলিমদের জন্য মনোনিত বিশেষ প্রতিনিধিদের কথা বলে আসছেন। এবং যতই নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে উঠল, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি ততই জোরালো হল। এই ঘটনাবলির মধ্যে যদিও কিছু সত্য ছিল, তবুও সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্পর্কে ব্রিটিশের উৎসাহদান ছিল ''অনস্বীকার্য ঘটনা''। অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেন, ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং মুসলিম ও হিন্দু উচ্চ শ্রেণির সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বার্থের ব্যাপারে একটা উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য ছিল, যা কিনা ''প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই'' মুসলিম লিগের দ্রুত সাফল্যকে ব্যাখ্যা করে। মুসলিম লিগ মুসলিম জনগণের কাছে গিয়ে তাদের নেতা হিসাবে দায়িত্ব নিল। কিছু আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম যদিও লিগের সঙ্গে সহমত ছিল না। প্রথমত উগ্র জাতীয়তাবাদী আহবার আন্দোলনের শি(িত ত(ণ মুসলিমেরা আলিগড়ের আনুগত্যের রাজনীতি (Loyalist Politics) এবং বড়ো নবাব এবং জমিদারদের অপছন্দ করত। এই আন্দোলনের বড়ো নেতাদের মধ্যে মওলানা মোহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, হাসান ইমাম, মওলানা জাফর আলি খান এবং মাজহার-উল-হক উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত দেওবন্দ (Deoband) স্কুল পরিচালিত একশ্রেণির ঐতিহ্যশালী মুসীলম

পণ্ডিত ব্যক্তি(ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রদর্শন করতেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপে(া উল্লেখযোগ্য হলেন, ত(ণ মওলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি কায়রোর আল আজহার (Al Azhar) বি(েবিদ্যালয়ে শি(ালাভ করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৯১২ সালে তিনি Al Hilal নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন যাতে তিনি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তবে, আজাদের মতো কিছু মানুষ বাদে অধিকাংশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মুসলিমই রাজনীতিতে আধুনিক ধর্মনিরপে( ভাবধারাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি।

ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্কে এমনকি মুসলিম লিগেরও মোহমুক্তি( ঘটল ১৯১১ সাল নাগাদ। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে পুনরায় ঘোষণা করলেন। মুসলিম রাজনীতিকদের উচ্চ শ্রেণির কাছে এটা একটা বিরাট আঘাত। ''দিল্লি ভিত্তিক মুঘল-মহিমা থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাতে মুসলিম মতামত প্রশমিত হল না এবং বস্তুতপ( ইতালীয় এবং বলকান যুদ্ধে (১৯১১-১২) তুরস্ককে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় তারা ব্রিটিশদের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হল। এছাড়া ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে আলিগড়ে মুসলিম বি(েবিদ্যালয়ের প্রস্তাব হার্ডিঞ্জ কর্তৃক প্রত্যাখান এবং ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে কানপুরে মসজিদ সংলগ্ন একটি মঞ্চকে (Platform) ভাঙ্গা নিয়ে দাঙ্গাও উল্লেখযোগ। তথাকথিত ''ত(ণ তুর্কিরা'' ১৯১২ সালে মুসলিম লিগের দখল নিল এবং দলকে অধিকতর উগ্রপন্থার দিকে চালিত করল। জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের সঙ্গে কিছু সমঝোতা আর ত্র(মবর্ধমান ইসলামবাদী অভিমুখে দল চালিত হল।'' ১৯১৩ সালের মার্চে মুসলিম লিগ এমনকি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল, যাতে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক স্বশাসন দাবি করাই তাদের ল(্য বলা হল। এভাবে লিগ এবং কংগ্রেস সামরিকভাবে পরস্পরের কাছাকাছি হল।'' খিলাফত আন্দোলন এবং সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সহযোগিতার একটা পর্যায় আরম্ভের সূচনা হল।'' সাম্প্রদায়িক শান্তি এবং সহযোগিতার অনেক প্রচেষ্টা মুসলিম সুবিধাবাদ দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। মুসলিম লিগ ''devide and rule''এর ছন্দে নেচে উঠল এবং অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে রাজনীতির খেলা খেলল পৃথক রাষ্ট্র পাওয়ার জন্য যদিও মুসলিমদের একটি ছোটো অংশ ধর্মনিরপে( ভারতে থেকে গেল।

## ৩.৪ গ্রন্থপঞ্জি


Bipan Chandra : Nationalism and Colonialism in modern India, New Delhi, 1977.

Bipan Chandra : Communalism in modern India, New Delhi, 1993.

## একক ৪ ❑ ভারতের জাতীয় আন্দোলন পরিবর্তনশীল অবস্থা

গঠন ঃ


৪.১ ভূমিকা

৪.২ নরমপন্থী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা এবং চরমপন্থার বৃদ্ধি

৪.৩ বঙ্গভঙ্গ

৪.৪ স্বদেশি আন্দোলন তার ঝোঁক, স্বদেশি এবং বয়কট

৪.৫ সন্ত্রাস

৪.৬ চরমপন্থার প্রভাব

৪.৭ ''মোর্লি-মিন্টো সংস্কার'' প্রে(াপট

৪.৮ ১৯০৯ সালের সংস্কার (Reforms)

৪.৯ মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা

৪.১০ গ্রন্থসূচি

৪.১১ প্র(াবলি


## ৪.১ ভূমিকা

এই অংশে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পরিবর্তনশীল অবস্থা নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, আদি কংগ্রেসের নরম পন্থা যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হল, এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এর জনপ্রিয়তা নষ্ট হল। দলের মধ্যে একটি চরমপন্থী দল আত্মপ্রকাশ করল এবং বিপুল জনসমর্থন পেল, বিশেষত স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে যা কিনা বঙ্গ বিভাগের (১৯০৫) বি(দ্ধে আয়োজিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের একটা সংকট দেখা দিল যা পরে ভারতের মুসলিম লিগ নামে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

## ৪.২ নরমপন্থী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা এবং চরমপন্থার জন্ম

স্পষ্টতই নরমপন্থী আদি কংগ্রেসী রাজনীতির কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। নব্যশি(িত অথচ বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণি অগণতান্ত্রিক সংবিধানের এবং নরমপন্থীদের চাপ-সমঝোতা-চাপ (PCP) অবস্থানের জন্য হতাশ হচ্ছিল এবং আরও বলা যায় যে তাঁদের অধিকাংশ দাবিই ছিল অপূর্ণ। তাঁরা একটা সমান্তরাল সংস্কৃতি এবং আদর্শগত আন্দোলন থেকে প্রেরণা এবং আদর্শ আহরণ করল এবং নরমপন্থী নেতাদের রাজনৈতিক ভি(াবৃত্তিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করল। অবশ্য কার্জন-প্রশাসন এর ভ্রান্তিই তাঁদের অনুভূতিকে তীব্রতর করল এবং চরমপন্থী রাজনীতির পথকে প্রশস্ত করল।

কার্জনের ভাইসরয় থাকাকালীন, প্রশাসনে নতুন পরিস্থিতি এবং নীতি, জাতীয় সংগ্রামে একটা চিরস্থায়ী পরিবর্তিত রূপ দিল। কার্জন, এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রকৃত সংঘর্ষ তিনটি পরপর ঘটনার মধ্য দিয়ে এল ১৮৯৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে পরিবর্তন, ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং বাংলা ভাগ। প্রথম দুটি ব্যবস্থায় সংবিধিবদ্ধ দুটি সংস্থার উপরে রাজকীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ এল এবং ফলে জাতীয়তাবাদীদের একটি বড়ো অংশের বিবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কিন্তু বঙ্গ বিভাগের মতো অনভিপ্রেত ব্যবস্থা স্পষ্টতই বিপুল প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটাল। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা প্রয়োজন।

## ৪.৩ বঙ্গবিভাগ

বঙ্গ বিভাগের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে, বিশেষত প্রসাশনিক গুরুত্ব এবং রাজনৈতিক দিক, এর সৃষ্টি থেকে যা অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে প্রশাসনিক কারণে (সুবিধার্থে) বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন হ্রাসের প্রস্তাব ১৮৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে উঠেছিল যা' পরে পরিপূরক হিসাবে আসাম এবং শ্রীহট্টের পৃথকীকরণের প্রস্তাবরূপে ১৮৭৪ সালে দেখা গেল এবং ১৮৯৬-৯৭ সালে চিফ্ কমিশনার উইলয়িাম ওয়ার্ডের প্রস্তাব ছিল চট্টগ্রাম ডিভিসন, ঢাকা এবং ময়মনসিংহকে তাঁর প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার। বস্তুত ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক দিকই ছিল নিশ্চিতরূপে প্রশাসনিক মহলের মুখ্য বিবেচ্য। ওয়ার্ডের প্রস্তাব লেফটেনান্ট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেসারের সমর্থন পেল। পরে লর্ড কার্জন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং অবশেষে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে প্রস্তাবটি যথাযথভাবে সম্পাদিত আকারে হোম সেক্রেটারি Risley কর্তৃক ঘোষিত হল। (Risly's letter of ডিসেম্বর ৩, ১৯০৩)। এই প্রাথমিক পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলেন সম্মিলিতভাবে ফ্রেসার, বিজলি এবং কার্জন এবং অবশেষে ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হল। এই সময় থেকে ব্যবস্থাটির পিছনে রাজনৈতিক বিবেচনা পরিষ্কার হল। নতুন পূর্ববঙ্গ এবং আসাম যা ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং রাজসাহী ডিভিসনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল। পার্বত্য ত্রিপুরা এবং মালদহও এর সঙ্গে গেল। গোপন সরকারি নথিপত্র থেকে যা জানা যায় তাতে এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত দ্বিতীয় পর্যায়ে। ওই সময়ে এবং পরবর্তী জাতীয়তাবাদীরা হিন্দু-মুসলিম টানাপোড়েনে ইচ্ছাকৃত উৎসাহদানে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তার সমর্থন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় কার্জন প্রদত্ত বহু আলোচিত বক্তৃতা থেকে পাওয়া যায়, যাতে তিনি পূর্ববঙ্গীয় মুসলিমদের এই সম্ভাবনার কথা বলেন যে, প্রাচীন মুসলমান ভাইসরয় এবং রাজাদের দিন থেকে তারা যা পাননি এখন তারা একত্রিত হয়ে তাই পাবেন। কিন্তু এই সময় প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল মূলত পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা (সুমিত সরকার)। এটা যথেষ্ট পরিষ্কার বোঝা যায়, হোম সেক্রেটারি H.R. Risley'র ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৬ ডিসেম্বরের দুটি note থেকে। কার্জন আরও নির্দিষ্টভাবে বলেন "আমাদের প্রস্তাবের রাজনৈতিক সুবিধার সবচেয়ে বড়ো গ্যারান্টি এই যে কংগ্রেসদলের কাছে এই প্রস্তাব পছন্দ নয়।"

## ৪.৪ স্বদেশি আন্দোলন ঝোঁক, স্বদেশি এবং বয়কট

বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হল অভূতপূর্ব। প্রথমে বাঙালিদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ জাগ্রত হল যাকে

চালনা করে এগিয়ে নিয়ে গেল শি(িত বাঙালি ''ভদ্রলোক''। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক ঐক্যের পরিপ্রে(িতে এবং জাগ্রত আত্মবিশ্বাস এবং অহঙ্কারে কার্জনের সমস্ত পরিকল্পনাকে জাতীয় অপমান বলে ধরা হল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে গত কুড়ি বছরের মৃদু বি(োভ যা সম্ভবত একটি সীমিত অংশকে প্রভাবিত করেছিল এবং যার ফলে প্রাপ্তি ছিল যৎসামান্য তার উপর একটা অসন্তোষ দেখা দিল কিন্তু জাতিগত বিভেদ পন্থা এবং শ্বেত ঔদ্ধত্যের প্রতি অসন্তোষ অনেক বিস্তৃতভাবে অত্মপ্রকাশ করল। তৃতীয়ত, ত্র(মশ একটি তীব্র আন্দোলন সমগ্র বাংলায় গড়ে উঠল বঙ্গ বিভাগের বি(দ্ধে— যা ছিল ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ের স্বদেশি আন্দোলন। যদিও হিন্দু 'ভদ্রলোক' সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল এই আন্দোলনের দুর্গ, কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে জনতার ভিন্নতর অংশও এতে অংশ নিয়েছিল। প্রকৃতপ(ে জাতীয় রাজনীতিতে এই আন্দোলন একটা নতুন মাত্রা এনে দিল এবং জাতীয় রাজনীতিকে আরও জঙ্গি আন্দোলন এবং চরমপন্থার দিকে নিয়ে গেল।

প্রথম দিকে অবশ্য, দেশভাগের বি(দ্ধে প্রচলিত নরমপন্থা। যেমন সংবাদ মাধ্যমে প্রচার, সভা, প্রতিবাদলিপি প্রেরণ এবং বড়ো সম্মেলন, ইত্যাদি করা হল। এইসব প্রচলিত যখন ব্যর্থ হল, তখন নতুন পথের সন্ধান আরম্ভ হল। তখনই এল ব্রিটিশ পণ্যের বর্জন, যার প্রস্তাব প্রথম এল ১৯০৫ সালের ১৩ জুলাই কৃষ(কুমার মিত্রের সাপ্তাহিক পত্রিকা সঞ্জীবনী (Sanjivani)-তে এবং তারপর তা' গৃহীত হল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো গু(ত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতাদের দ্বারা— অবশ্য কিছু দ্বিধার পর।

সরকারি আধিকারিক দ্বারা চাপ এবং ভীতি প্রদর্শনের পর, সরকারি শি(া প্রতিষ্ঠানগুলিও বয়কটের আওতায় এল। এর সঙ্গে যুক্ত( হল রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ব্যাপক আবেদন— রাখী বন্ধন এবং অরন্ধন। কিন্তু বঙ্গে এই আন্দোলনের মধ্যে ত্র(মশ আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিল। আপাতদৃষ্টিতে দুটি শ্রেণি দেখা গেল ''With some, boycott became the starting point for the formulatin of a whole range of new methods and the abrogation of the Partition Came to be regarded as no more than the pettiest & narrowest of all political objects' (Aurobindo Ghosh in April-1907) অর্থাৎ কিনা বয়কট হল নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য একটা নতুন পন্থার শু( এবং বঙ্গভঙ্গ রদকে মনে করা হল একটি সংকীর্ণ এবং সামান্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এটা হল ''স্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের একটি ধাপমাত্র। সুরেন্দ্রনাথের মতো, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতে, বয়কট হল, ম্যাঞ্চেস্টারের আর্থিক ( তির মাধ্যমে বঙ্গভাগ রদের জন্য একটা শেষ প্রচেষ্টা। প্রতিষ্ঠিত নরমপন্থী নেতারা কোনোত্র(মে ১৯০৫ সালের ১৬ নভেম্বর শি(ায়তন বয়কট ফিরিয়ে নিলেন এবং মর্লির সেক্রে(টারি অফ স্টেট নিয়োগের পর, তাঁর মহৎ উদারপন্থী সুনামের সুযোগে 'আবেদন নিবেদনের' নিরাপদ পাড়ে ফিরে এল।

অধ্যাপক সুমিত সরকার, পরিচিত নরমপন্থী প্রতিত্রি(য়া ছাড়াও, স্বদেশি আন্দোলনের তিনটি গু(ত্বপূর্ণ ঝোঁক ল( করেছেন। প্রথমটিকে বলা যায় ''গঠনমূলক স্বদেশি''-এর অর্থ ''বৃথা এবং আত্ম-অবমাননামূলক আবেদন নিবেদনের রাজনীতি (Mendicant Politics) পরিত্যাগ করে, স্বদেশি শিল্প, জাতীয় বিদ্যালয় গঠন এবং গ্রামোন্নয়ন ও পুনর্গঠনের চেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার এবং সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী ছিলেন এই পন্থার সমর্থক এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ প্রবক্ত(া। তাঁর ''স্বদেশি সমাজ'' বক্তৃ(তায় (১৯০৪) রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গঠনমূলক কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। যেমন অধ্যাপক সরকার বলেছেন, ''অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বদেশ বান্ধব সমিতি তার প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে ১৯০৬ সেপ্টেম্বর। বরিশালে, ৮৯টি সালিশী সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৫২৩টি গ্রাম্য বিবাদের মিমাংসা করেছেন বলা হয়েছে এবং প্রায় এক হাজার গ্রাম-সমিতি বঙ্গদেশে কাজ করছে বলে ১৯০৭-এর এপ্রিলে একটি প্রচারপত্রে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ঝোঁকটি দেখা গেল উত্তেজিত

শি( ত বঙ্গদেশীয় যুবকদের মধ্যে, যারা তথাকথিত গঠনমূলক স্বদেশি মতবাদে খুশি ছিল না এবং তাই আরও রাজনৈতিক চরমপন্থা গ্রহণে আগ্রহী হল। বিপীন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং যুগান্তর দলের ত(ণরা এই শ্রেণিভুক্ত( । ১৯০৬ সাল থেকে, তাঁরা সবাই স্বরাজ এর জন্য সংগ্রামের ডাক দিচ্ছিল। এ( ত্রে বলা প্রয়োজন যে, এই দলের পার্থক্য কেবল তাঁদের দাবির মধ্যেই ছিল না( তাঁদের মধ্যে, তিলকের মতো কেউ কেউ, ১৯০৭ সালে কিছু কর্মেও সম্মত ছিল। ''আরও মৌলিক পার্থক্য ছিল প্রকৃতপ( পদ্ধতিগত এবং এই সময়ে ১৯০৭-এর এপ্রিলে তাঁর বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় পর পর কয়েকটি রচনায় অরবিন্দের কাছ থেকে এল সেই বিখ্যাত বক্ত(ব্য, যা কিনা পরে ''নিষ্( য় প্রতিরোধ এর নীতি'' হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ আশ্রম এবং স্বাদেশিকতা এবং আত্মোন্নতির 'ধারণা যথেষ্ট নয় বলে, তিনি ''সুসংগঠিত এবং অবিশ্রান্ত বয়কট'' এর ডাক দেন যাতে ব্রিটিশ পণ্য পরিত্যাগ, সরকারি শি( া, বিচার এবং প্রশাসনকে বয়কট করা (সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি শিল্পের উন্নতি, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন এবং সালিশি কোর্ট স্থাপন করা) এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন, ইংরেজ অনুগতদের 'সামাজিক বয়কট' এবং ব্রিটিশ দমননীতি সহ্যের সীমা ছাড়ালে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অবলম্বন করা। বস্তুতপ( , এই সময়েই আমরা পাই সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ গান্ধিবাদী রাজনৈতিক প্রোগ্রামটিকে, অবশ্যই অহিংসার মতটি বাদে। তৃতীয়ত, স্বদেশি ভাবনার মধ্যে এই সময় তীব্র হিন্দু পুন(খানের ঝোঁক দেখা গেল, যা, উপরোক্ত( দুটি ঝোঁককে কখনও কখনও ছাড়িয়ে যেত। এরই ফলে, স্বদেশিরা প্রায়শই মন্দিরে শপথ নিত, জাতীয় শি( াতে অংশত পুন(খান সূচি ছিল, আর ছিল শিবাজি উৎসব যাতে মূর্তি পূজাও হত। এইভাবে, মৌলিক রাজনীতি এবং আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদ একসঙ্গে মিশে গেল। স্বদেশি আন্দোলনে, বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক ঝোঁক পরস্পর অসম্পর্কিত ছিল না— নরমপন্থী আবেদন নিবেদনকারী থেকে ব্যক্তি( গত চরমপন্থা পর্যন্ত। অধ্যাপক সুমিত সরকার যেমন বলেছেন, ''The Central historical Problem of the period is why this became so since an explanation in terms of the external factor of British repression alone hardly sufficient.'' অধ্যাপক সরকার ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত সময়ে, স্বদেশি আন্দোলনের নৈতিক উপাদানের (Principle Components) শক্তি( এবং আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এর উত্তর খুঁজে পান  বয়কট, জাতীয়শি( া শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন জনসংযোগ পদ্ধতি।

## ৪.৫ চরমপন্থী

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হল চরমপন্থার দিকে পরিবর্তন। যেহেতু বংলা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রদূত, চরমপন্থাও এখানে প্রথম প্রকাশিত হল। প্রাথমিক বিপ্-বী দল গড়ে উঠল ১৯০২ সাল নাগাদ, মেদিনীপুর এবং কলকাতা উভয় জেলাতেই অনুশীলন সমিতি নামে। এর প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন, প্রমথ মিত্র এবং অরবিন্দ প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। প্রারম্ভে অবশ্য, সমিতির কাজকর্ম, শারীরিক এবং নৈতিক শি( াতেই অধিক সীমাবদ্ধ ছিল, কোনও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক ত্রি(য়াকর্ম ছিল না। ১৯০৬ সালের এপ্রিল থেকে, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ করলেন এবং তার পরেই কয়েকজন ঘৃণিত (hated) ইউরোপীয় (যেমন পূর্ব বঙ্গের লেফটেনান্ট গভর্নর ফুলারকে) হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা হল। এই সময়ে, হেমচন্দ্র কানুনগো বিদেশে গেলেন সেনা এবং রাজনৈতিক ট্রেনিং নিতে এবং ফিরে এসে, কলকাতার শহরতলি, মানিকতলার একটি বাগান-বাড়িতে একটি সম্মিলিত ধর্মীয় বিদ্যালয় এবং বোমার কারখানা স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ এপ্রিল ( দিরাম

বোস এবং প্রফুল্ল চাকি, ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন এবং কয়েকজন নির্দোষ ইউরোপীয়কে হত্যা করল। এবং হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অরবিন্দসহ পুরো দলটাই ধরা পড়ল। পূর্ববঙ্গে, অবশ্য, পুলিন দাসের সুসংগঠিত ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে চরমপন্থা অনেক বেশি দ( ভূমিকা পলন করছিল। এটা জানা প্রয়োজন যে, ''Terrorism'' কথাটা একটি অপব্যবহৃত শব্দ। কারণ শহরে গণঅভ্যুত্থান বা গ্রামীণ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ, কোনোটিই এই চরমপন্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ( ত্রে চরমপন্থা বলতে, অত্যাচারী সরকারি অফিসারের বা দেশদ্রোহীর হত্যা, অর্থের প্রয়োজনে 'স্বদেশি' ডাকাতি, বা ব্রিটেনের বি(দ্ধে বিদেশি শক্তি(র সঙ্গে সেনা-ষড়যন্ত্র। যেমন, অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেন, ''Revolutionary terrorism was to Constitute in the end the most Substantial legacy of Swadeshi Bengal, Casting a spill on the minds of radical educated youth for at least a generation or more'' অর্থাৎ বিপ-বী জঙ্গি আন্দোলন অবশেষে স্বদেশি বাংলার একটা উত্তরাধিকার পরবর্তী অনন্ত একটা মৌলিক শি( ত ত(ণ প্রজন্মের উপর রেখে গেছে।

## ৪.৬ জঙ্গি আন্দোলনের প্রভাব

১৯০৫-১৯০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের অন্যান্য অংশে চরমপন্থার কী প্রভাব পড়েছিল? স্পষ্টতই এই প্রভাবের পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন অঞ্চলিক এবং স্থানীয় উপাদানের উপর নির্ভর করেছে কিন্তু একটি সাধারণ উপাদান ছিল বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অংশে বিশেষত বিহার, ওড়িষ্যা, আসাম এবং উত্তর প্রদেশে, বিভিন্ন চাকুরি এবং পেশায় সংখ্যাধিক শ্রেণি হিসাবে শি( ত বাঙালিদের জনপ্রিয়তার ত্র(মাগত হ্রাস। এর ফলে চরমপন্থা ওই সব প্রদেশে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং উচ্চশ্রেণি-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হল।

''এইসব ঝোঁক মানুষকে মৌলিক ভাবনা থেকে দূরে রাখল, যে ভাবনা মূলত বাংলার সঙ্গে সং(-ষ্ট। যেমন, ডেলি তাঁর Study of Allahabad, এ দেখিয়েছেন, মদনমোহন মালব্য বা মোতিলাল নেহ(র মতো গু(ত্বপূর্ণ নেতারা এমনকি এই সময়েও প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতির মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চিন্তা করতেন। ''চরমপন্থা তাই কেবল যথেষ্ট মারাঠি এবং বাঙালি অধ্যুষিত বেনারসেই একটি প্রচণ্ড শক্তি( হয়ে উঠেছিল।''

পাঞ্জাবের অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্ন। এখানে ১৮৯০ সাল থেকেই শি( া, বিমা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ( ত্রে একটা গঠনমূলক স্বদেশি ধারা ছিল। বিদেশি যন্ত্রের বয়কট আরম্ভ হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। এই সব ( ত্রে আর্যসমাজীরা ছিল বিশেষভাবে সক্রি(য় এবং যা ছিল জঙ্গি হিন্দু চেতনা দ্বারা চিহ্নি(ত। ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ সালের চরমপন্থার দিকে পাঞ্জাবের স্বল্প সময়ের ঝোঁককে অংশত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দ্বারা বিবচেনা করা যায়। Punjab National Bank এবং Bharat Insurance এর পরিচালনা নিয়ে Lajpat এবং Hans Ray-এর নেতৃত্বাধীন আর্য সমাজী এবং Lala Harkishan Lal-এর কর্তৃত্বাধীন ব্রাহ্ম-সমর্থক দলের মধ্যে একটা কলহ ছিল।

লাজপৎ গ্রুপ তাঁদের সংবাদপত্র, ''পাঞ্জাবী'' প্রকাশ করতে আরম্ভ করল ১৯০৪ সালের অকটোবর, যা কিনা, লালা হরকিষেণ লাল Tribuine এর বি(দ্ধতা করার জন্য। যাই হোক, চরমপন্থার পাঞ্জাবী সংস্কারণটি ১৯০৬ এর শেষ পর্যন্ত হয়ে রইল নরমপন্থী এবং ব্রিটিশের কাছ থেকে ত্র(মাগত প্ররোচনার ফলেই ১৯০৭ সালের গোড়ার দিকে পাঞ্জাবের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে গেল। ''পাঞ্জাবের বুদ্ধিজীবী মহল ত্রে(াধে জ্বলে উঠল যখন ''Punjabi'' পত্রিকাকে জাতিগত অবমাননাকর লেখার দায়ে আদালতে নেওয়া হল, যখন কিনা, একই সময়ে ভারতীয়দের

সম্পর্কে কুৎসিত গালাগালি দেওয়া হচ্ছিল Civil and Military Gazelle পত্রিকায়, যা, সম্পূর্ণভাবে কর্তৃপ( র অগোচরে রইল।'' পাঞ্জাবের চাষিরা শিখ, মুসলিম এবং হিন্দু নির্বিশেষে লায়ালপুর এর চারদিকে অবস্থিত চেনার খাল কলোনি সম্পর্কে গৃহীত সরকারি ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হল এবং আরও বেশি জঙ্গি হয়ে উঠল। তিনটি বিষয় বিশেষভাবে পাঞ্জাবের চরমপন্থাকে ধীরে ধীরে স্তিমিত করল—

(ক) রাজনৈতিক সভার উপরে নিষেধাজ্ঞা, সরকারি দমন এবং লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংয়ের (deportation) নির্বাসন।

(খ) চেনাব কলোনি বিল সম্পর্কে কিছু সরকারি ছাড় এবং জলকরের হ্রাস।

(গ) ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে নির্বাসিতদের মুক্তি( প্রদান।

মাদ্রাজ এবং মহারাষ্ট্রেও চরমপন্থা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব অর্জন করল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, দুটি অঞ্চল বিশেষভাবে চরমপন্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল— অন্ধ্রের ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং তি(নেলভেলি জেলা। Washbrook এ ব্যাখ্যা এ সম্পর্কে একান্তই দলাদলিপূর্ণ—মাখলাপুর, এগমোর এবং মফস্সলের (দ্র দলের মধ্যে বিবাদ। ব্যাখ্যাটি, বৃহদংশে অতিসরলীকৃত। বন্দেমাতারম আন্দোলন যা ছড়িয়ে পড়েছিল রাজামুন্দ্রী, কাকিনাড়া এবং মসলিপত্তমে, তা' M. Krishna Rao-এর আমন্ত্রণে ১৯০৭ এর এপ্রিলে বিপিন পালের আগমনে একটা বড়োরকমের ব্যাপকতা পেয়েছিল। দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে ছাত্র ধর্মঘট হল এবং অন্ধ্রে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল। তি(নেলভেলিতে পরিস্থিতি ব্রিটিশ দৃষ্টি ভঙ্গিতে ছিল ভয়ঙ্কর। বিশেষ সত্রি(য় কেন্দ্রটি ছিল তুতিকোরিন বন্দর। ১৯০৬-এর অকটোবরে ইতিমধ্যেই একটি স্বদেশি Steam Navigation Company স্থাপিত হয়েছে যা' এই বন্দরনগরী থেকে কলম্বো পর্যন্ত স্টিমার চালাচ্ছে। ''মৌলিকতার দিকে একটা দ্রুত অগ্রগতি 1908 এর জানুয়ারী থেকে স্পষ্ট হল, সুব্রমানিয়াম শিবার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, যিনি মাদুরার অনুন্নত সমাজের একজন বি(োভকারী। এর সঙ্গে ছিলেন চিদাম্বরম পিল্লাই। এঁরা স্বরাজের বাণী প্রচার করলেন, বয়কট আন্দালনকে প্রসারিত করলেন এবং যদি পুলিশ-রিপোর্ট বি(োসযোগ্য হয়, মাঝে মাঝেই অধিকতর অহিংস পদ্ধতির উপর জোর দিচ্ছিলেন। বিদেশি মালিকানার Coral Coton Mills-এ একটি বড়ো ধরনের ধর্মঘট হল। ''মার্চের মাঝামাঝি সভাসমিতি বন্ধের ব্রিটিশ প্রচেষ্টায় এবং শিবা ও পিল্লাইকে কারাদণ্ড দেওয়ায়, দোকানপাট বন্ধ হল, পৌরসভা এবং প্রাইভেট সুইপাররা প্রতিবাদ ধর্মঘট করল, তুতি কোরিনের গাড়িচালকরা ধর্মঘট করল, পৌরসভার অফিস, আদালত এবং তি(নেভেলরীর থানা আত্র(ান্ত হল উভয় শহরে ১১ থেকে ১৩ মার্চ (১৯০৮) গুলি চলল।'' এই সময় থেকে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত তামিল কবি সবুমানিয়া ভারতী, তামিল বিপ-বীদের মধ্যে একটা দৃষ্টান্তমূলক প্রভাব প্রয়োগ করেন।

মহারাষ্ট্রে চরমপন্থা তিলকের মতো বিশাল নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে বিস্তৃত হল। সেখানে মৌলিক সাংবাদিকতা দ্রুত বর্ধিত হল এবং স্বরাজ ও বয়কট সম্পর্কিত প্রচার উৎসাহ ব্যাঞ্জকভাবে তিলক এবং তার সঙ্গীদের দ্বারা প্রচারিত হল। ''মহারাষ্ট্র এবং বম্বে শহরে ১৯০৭ এর শেষ এবং ১৯০৮ এর শু(তে তিলকীয় সত্রি(য়তার সঙ্গে দুটো বড়ো ধরনের নতুন প্রচেষ্টার সূত্রপাত হল— মদের দোকানে পিকেটিং এবং মূলত মারাঠী শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।'' সাধারণভাবে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কাজের (ে ত্রে চরমপন্থী নেতৃত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু বাংলার উগ্রপন্থা সম্পর্কে লেখা তাঁর কেশরি নিবন্ধের জন্য যখন তিলকের বিচার হয় এবং তাঁকে শাস্তি হিসাবে ছ-বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হল, তখন বম্বেতে শ্রমিকশ্রেণি ত্রে(াধে ফেটে পড়ল। সুমিত সরকারের মতে, এটা ''আমাদের ইতিহাসের একটা বড়ো সন্ধি( ণ''।

ভারতের বিভিন্ন অংশে এই সব ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কংগ্রেস সম্মেলনেও প্রতিফলিত হয়েছে এবং অবশেষে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাটে কংগ্রেসের নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে একটা ভাগ হল। অনিল শীল, চরমপন্থীদের এই দলকে বলেন ''দলত্যাগীদের একটি সর্বভারতীয় মেলবন্ধন ''যারা স্থানীয়ভাবে তাদের যুদ্ধে পরাজিত।

এই assessment সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত করে। প্রথমত, কংগ্রেস তখনও এমন একটা সঠিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি যার দখল নেওয়া লাভজনক (worth ''capturing)। দ্বিতীয়ত চরমপন্থীরা বিশেষত বাংলা, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে ১৯০৭ থেকে ১৯০৮ সালে তাঁদের আঞ্চলিক অবস্থানে পরাজিত হয়নি। তৃতীয়ত কিছু নরমপন্থী নেতা নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করেন। তবে এইরকম প্রচেষ্টা শীঘ্রই নরমপন্থী নেতাদের বর্ধমান অনমনীয় মনোভাবে পরিবর্তিত হল। ইংল্যণ্ডে ( মতা দখলকারী লিবারাল সরকারের কাছ থেকে (reforms) আশাই, নরমপন্থী নেতৃত্বের এই হঠাৎ অনমনীয়তার মুখ্য কারণ।

## ৪.৭ ''Morley-Minto সংস্কার'' (প্রে( াপট)

১৯০৫ সালে বয়কট আন্দোলন সরকারকে হতবুদ্ধি করল। বয়কট্, এই প্রথম, ব্রিটিশ প্রভুদের দেখিয়ে দিল যে, বাংলা কেবল আবেদন করা ছাড়াও অন্য পন্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপ( ভারতে ব্রিটিশ-রাজের বি(দ্ধে প্রথম প্রত্যাঘাতই হল 'বয়কট' যা আমাদের জনগণ গ্রহণ করেছিল। যদিও বয়কট হল একটা আত্মর( ামূলক আন্দোলন কিন্তু প্রকৃত অর্থে আপসমিমাংসার একটা অস্ত্র। যে আপস-মিমাংসা এ( ত্রে চাওয়া হয়েছে, তা হল বঙ্গভঙ্গ রদ।

যখন বয়কট আরম্ভ হল, তখন জাতির ( াভ ছিল নির্দিষ্টভাবে বঙ্গ বিভাগের বি(দ্ধে সরকারের বি(দ্ধে নয়। বিদেশি প্রভুত্বকে অস্বীকার করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা নিঃসন্দেহে ছিল, কিন্তু তা ছিল জনগণের একটা আদর্শ। কোনো রাজনৈতিক কার্যত্র(মের প্রায়োগিক অংশ নয়। আত্মোন্নতি, স্বনির্ভরতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা উদ্দীপনা আমাদের দেশে জাগ্রত হচ্ছিল এবং সেই উদ্দীপনা বা মানসিকতাই বয়কটের মাধ্যমে রূপ নিল। সরকার আতঙ্কিত হল এবং জাতীয়তাবাদীদের উপর এমন দমন-পীড়ন আরম্ভ করল যা আগে দেখা যায়নি। সরকারি পীড়ন কেবলমাত্র আমাদের দেশপ্রেমের অহংকার এবং জাতীয়তাবোধকেই পরম ত্রে( াধের সঙ্গে জাগ্রত করল। বিশেষত Sir Bampfylde Fuller-এর তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গে সরকারি নীতি, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাল।

লর্ড কার্জনের পদত্যাগ এবং ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল হিসাবে লর্ড মিন্টোর নিয়োগ এবং মর্লির ভারতের সেত্রে( টারি অফ স্টেট হিসাবে নিয়োগ-এর ফলে এইরকম একটা বি( াসের সৃষ্টি হল যে, ভারত সরকার এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ভারতবাসীর অসন্তোষ এর কারণ দূর করে তাদেরকে শান্ত করা যায়। কিন্তু এই আশা শীঘ্রই ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। মিন্টো এবং মর্লি উভয়েই তাঁদের উদারনীতির দ্বারা ভারত শাসনের পরিবর্তে দমন পীড়নের প্রচলিত নীতির পথ ধরলেন। লর্ড মিন্টো ফুলারের ''Favourite wife'' নীতিই কেবল অনুসরণ করে চললেন না, তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বীজও বপন করলেন। পুনরায়, মিন্টোর হাতেই ভারতে দমনমূলক আইন সবচেয়ে খারাপ রূপ এবং মাত্রা পেল। সরকারের কণ্ঠরোধী নীতি মানুষকে সাংবিধানিক পথে তাদের অভিযোগ প্রকাশের সমস্তরকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করায় মনুষের ( াভ স্বভাবতই গোপন ষড়যন্ত্র এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পথ নিল। এভাবে যথাসময়ে সরকারি দমন নীতির অবশ্য ভাবী প্রতিত্রি(য়া হিসাবে, গোপন উগ্রপন্থী

বোমার রূপ ধরে এল, চলল গোপন হত্যা। চরমপন্থার বৃদ্ধির মূল পাপ, তাই সরকারের দ্বারেই নিহিত হওয়া উচিত। কিন্তু একবার উগ্রপন্থা আরম্ভের পর সরকার অন্য কোনো আপাত অস্ত্র না পেয়ে অধিকতর সংগঠিত পদ্ধতিতে দমন পীড়নের মাধ্যমে এর প্রতিকারের পথ নিল। এর পর মিন্টো ও মর্লির তত্ত্বাবধানে ভারত সরকার কয়েকটি সাংবিধানিক সুবিধা দিল যাতে নরমপন্থী নেতারা এবং অন্যান্য ত্রি(য়াশীল শক্তি( সরকারের অনুগমন করে। এইসব সুবিধাই ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (Morley-Minto Reforms Act of 1909)।

## ৪.৮ 1909 এর সংস্কার

১৯০৫ সাল থেকে ভারত সরকারের নীতি দুটি গু(ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নি(ত। একদিকে দমন-পীড়ন অন্য দিকে আপস। বয়কট এবং স্বদেশি অন্দোলনের দ্রুত বিস্তার ব্রিটিশ জাতিকে বিস্মিত করেছিল। ভারত সরকার রাষ্ট্রনেতাদের উপযুক্ত( নীতি গ্রহণ করে জনতার অসন্তোষ দূর করতে না পেরে চিরাচরিত দমননীতি গ্রহণ করল। দেখা গেল ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ১৯০৮ এবং ১৯১০ এর Press act দ্বারা, জনপ্রিয় নেতাদের নির্বাসিত করা, অনেককে বন্দি করা, সভা সমিতি নিষিদ্ধ করা এবং আরও অনেক ধরনের দমনমূলক কাজ। কিন্তু দমননীতি সর্বদাই একটা মৃদু প্রতিষেধক এবং সেই সময় মিন্টো এবং মোরলির চেয়ে ভালো আর কেউ বুঝত না। ফলত ভারত সরকার সাংবিধানিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিল, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রইল প্রচলিত আইনগুলিও। ভাইসরয় এবং সেক্রে(টারি অফ স্টেট উভয়েই বি(্বাস করতেন যে সাংবিধানিক পরিবর্তন দ্বারা সরকার ভারতীয় নরমপন্থীদের এবং ভারতীয় অভিজাতদের সমর্থন পাবেন। ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে কংগ্রেস সংসদে প্রতিনিধিত্বের প্রসার চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে ব্যস্ত পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা ভারতীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন চেয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনের সেক্রে(টারি অফ স্টেটের পরিষদেও। মিন্টো এবং মোর্লি ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তাধারার উদারপন্থী মতাবলম্বী এবং উভয়েই এই প্রস্তাবগুলি কিছু অংশে পুরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রস্তাব রচনা অত্যন্ত দীর্ঘ প্রক্রি(য়া, অংশত সরকারের সঠিক ইচ্ছার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে গু(ত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি(বৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তাই অবশেষে ১৯০৯ সালে আইন প্রণয়ন সম্ভব হল।

মর্লি-মিন্টো সংস্কারের সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি সংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাঁদের ( মতার প্রসার। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের অতিরিক্ত( সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৬০ করা হল। মাদ্রাজ, বোম্বে এবং বাংলার জন্য সর্বোচ্চ ৬০ করা হল। মাদ্রাজ, বোম্বে এবং বাংলার জন্য সর্বোচ্চ ৫০, যা সংযুক্ত( প্রদেশ (VP) এবং পূর্ব বঙ্গের জন্যও বরাদ্দ হল। অন্যদিকে পাঞ্জাব এবং বার্মার জন্য ৩০ পর্যন্ত। মোর্লি স্থির করলেন যে প্রাদেশিক পরিষদে সরকারি সংখ্যাধিক্যের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই সংখ্যাধিক্য জ(রি। ফলে সদস্যসংখ্যার তাৎ( ণিক বৃদ্ধি হল ১২৪ থেকে ৩৩১ এবং আবশ্যিক সদস্য সংখ্যা ৩৯ থেকে হল ১৩৫ যাঁরা পূর্বেই নির্বাসিত। নির্বাচনীবিধি এমনভাবে করা হল যাতে সবস্বার্থবাহী শ্রেণির প্রতিনিধিত্বই নিশ্চিত হয়। একটি উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তে মুসলিমদের স্বনির্বাচিত পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি মেনে নেওয়া হল। এবং আরও সুবিধা এভাবে দেওয়া হল যে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে তার রাজনৈতিক গু(ত্ব, সাম্রাজ্যের প্রতি সেবা এবং সংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক হারে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ( ত্রে একটি গু(ত্বপূর্ণ মৌলিক সভা নির্বাচিত করতে হবে প্রাদেশিক পরিষদ দ্বারা যেখানে বেসরকারি সদস্যরাই কেবল ভোট দেবেন। ১৯১২ সালের পরিবর্তনের পর তাতে ছ'জন কাউন্সিল

সদস্যকে নেওয়া হল, কম্যান্ডার ইন্ চিফ্, হেড্ অফ দি প্রভিন্স যেখানে ৩৩ জন মনোনীত সদস্য ছিল, ২৪ জনের বেশি সরকারি নয়, ব্যবস্থা পরিষদ ১৩ জন সদস্যকে নির্বাচিত করত জমিদার দ্বারা ৬ জন এবং চেম্বার অফ কমার্স দ্বারা ২ জন। বাংলায় ছিল, প্রকৃতপ( ২৮ জন নির্বাচিত সদস্য। ২০ জন মনোনীত (১৬ সরকারি), ২ জন বিশেষজ্ঞ এবং ৩ জন কাউন্সিলর সব( ত্রেই, নির্বাচিত মৌলিক সভা ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত, কেবল Burma ছিল ব্যতিত্র(ম।

ব্যবস্থাপক সভার কার্য প্রসারিত করা হল যাতে আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হল। গভর্নর জেনারেলের ব্যয়প্রস্তাব কাউন্সিলে পেশ করা হবে এবং তারপর এর উপর যে কোনো সদস্য ট্যাকসের পরিবর্তন সংত্র(ান্ত কোনো প্রস্তাব বা নতুন ঋণ বা স্থানীয় সরকারকে অতিরিক্ত( বরাদ্দ প্রদান সংত্র(ান্ত প্রস্তাব আনতে পারবেন যা কিনা আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত আছে। এইসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিবৃতিটিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন এবং যে কোনো সময়ে প্রস্তাব আনা যাবে। এই প্রস্তাবের ফল হল, সরকার যাকে যথাযথ মনে করবেন সেই ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা। চূড়ান্ত বাজেট কাউন্সিলে পেশ করা হবে 24শে মার্চ এর মধ্যে। যখন যে কোনো পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা হবে। এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু কোনো নতুন প্রস্তাব আনা যাবে না। মিলিটারি, রাজনৈতিক এবং কিছু প্রাদেশিক বিষয়, রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে ইত্যাদির উপর কোনো আলোচনা হবে না। আরও বলা হল, Governor-General in Council যার উপর আলোচনা চাইবেন না, তার উপর আলোচনা নিষিদ্ধ। বিদেশি শক্তি(র সঙ্গে বা ভারতীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে বা বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা চলবে না।

আরেকটি পরিবর্তন বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ যা এই কর্তৃপ( দিয়েছেন তা হল জনস্বার্থ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব আনা যাবে। যদিও সেসব প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচ্য সূচি থেকে বাদ দেওয়া হবে যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। সভাপতি (পরিষদ) যে কোনো প্রস্তাবকে আলোচনার জন্য গ্রহণ নাও করতে পারেন, যা জনস্বার্থ সম্পর্কিত নয় বা প্রাদেশিক পরিষদে আলোচনার উপযুক্ত( নয়। প্রস্তাব সংশোধিত হতে পারে এবং গৃহীত হলে তা কেবলমাত্র সুপারিশের স্তরে থাকে।

১৯০৯ সালের আইনের সঙ্গে একটি ঘোষণা ছিল, যাতে গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে একজন ভারতীয়কে নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে সেত্রে(টারি অফ স্টেট একটি নতুন ব্যবস্থায় তাঁর নিজের পরিষদে দুজন ভারতীয়কে নিয়োগ করেন। গভর্নর জেনারেলের পরিষদে কোনও মুসলিমকে না নিয়ে কেবলমাত্র একজন হিন্দুকে নিয়োগের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে অসুবিধা ছিল। কিন্তু এই পদ( প জাতিগত সাম্য নীতি এবং ১৮৩৩ সালের নীতিপুরণের একটি সিদ্ধান্তমূলক ইঙ্গিত। সংস্কার প্রকল্পের রূপকাররা এই ত্রি(য়ার সঙ্গে ছিলেন সংগতিপূর্ণ। ভারতে একটি দায়িত্বপূর্ণ সরকার বা পার্লামেন্ট গঠন করার ধারণা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁরা মনে করতেন ত্র(মবর্ধমান অরাজক শক্তি(র বি(দ্ধে ভারতের উচ্চশ্রেণির অনুগতদের রাজশক্তি(র সমর্থনে সংঘবদ্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা থেকেই বিরত হওয়া উচিত নয়। এই মনোভাব নিয়েই, মিন্টো Lytton এর ধারণাকে পুন(জ্জীবিত করার কথা চিন্তা করলেন যাতে বড় প্রদান (chiefs) বা বড়ো জমিদারদের নিয়ে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন যা কিনা একই রকম সংস্থা যাতে স্বার্থবাহী প্রতিনিধিদের বহুল সংখ্যায় প্রদেশগুলিতে নিয়োগ করা হয়েছে। ধারণাটা ছিল, আইন প্রণয়নের পূর্বে স্বার্থ নিয়ে আলোচনার ভারতীয় অভ্যাসকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা, কিন্তু হোমরা চোমরা মোড়ল বা জমিদাররা তাদের সমক( নয় এমন ব্যক্তি(দের সঙ্গে বসতে অস্বীকার করল এবং প্রস্তাবটি অবশেষে একটি Imperial Council of Chiefs এর রূপ দেওয়ার জন্য চাপ আরম্ভ হল, যার গঠন সেই সময়ে যথাযথ বিবেচিত হল না। কিন্তু ঘটনাটি গু(ত্বপূর্ণ এই কারণে যে, অরাজকতার বি(দ্ধে সংগ্রামে

এমনকি গণতন্ত্রের বি(দ্ধে, এই সব মানুষকে তালিকাবদ্ধ করার ধারণার দিকে এটা একটা নিশ্চিত পদ(েপ। অধ্যাপক A. B. Keith-এর দৃষ্টিতে, ১৯০৯ সালের সংস্কার তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তা নিজ সরকার গঠনের প্রচারে বা প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাদের একটা ভালো দিক হল আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। ভারতীয় সদস্যদের প্রকৃত প্রস্তাবগুলোর মাধ্যমে ততটা নয়, যতটা হয়েছিল বিলগুলোর প্রচার এর মাধ্যমে, যা বিভিন্ন কমিটির দ্বারা পরী(িত হয়েছিল এবং তাঁদের পরামর্শের ফলেই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল এবং সিদ্ধান্তগুলি ফলপ্রসূ হয়েছিল। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে ১৯১৭ সালের শেষ পর্যন্ত গৃহীত ১৬৮টি প্রস্তাবের মধ্যে ৭৩টির সম্পর্কে নির্দিষ্ট কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং প্রদেশগুলোও একই রকম ফল দেখিয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে, ১৯০৯ সালের সংস্কার ছিল সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক। স্বায়ত্ব শাসনের নীতিকে সম্পূর্ণ উপে(া করা হয়েছিল এবং তাই চরমপন্থীরা সংস্কারকে অপমানজনক মনে করল নরমপন্থীরা সন্তুষ্ট ছিল না, কারণ সংস্কার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের অস্বীকার করেছিল এবং এইভাবে ভারতবাসীদের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবিকে অস্বীকার করেছিল। মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সংস্কারে স্বীকৃতি পাওয়ায়, নরম এবং চরমপন্থী উভয়েই তীব্র অপমানিত হল। ১৯০৯ সালের আইনের আর একটি দুর্বল দিক হল প্রশাসন এবং ব্যবস্থাবিভাগ উভয়ের পারস্পরিক দায়িত্বের অভাব। ব্যবস্থাপকদের দেশের প্রশাসনের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব ছিল না। প্রশাসনিক (মতা ছিল একচেটিয়া প্রশাসনিক বিভাগের এবং তারা কোনোভাবেই তাঁদের নীতি এবং কার্য পদ্ধতির জন্য ব্যবস্থাবিভাগের কাছে দায়বদ্ধ ছিল না এমনকি মুসলিমরা, যারা প্রথমে হর্ষোৎফুল্ল হয়েছিল ১৯০৯ সালের আইনে তাদের সম্প্রদায়ের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতির জন্য, তারাও হতাশ হল এই দেখে, যে ব্যবস্থাপরিষদের প্রকৃতপ(ে কোনো (মতা নেই এমনকি একজন প্রশাসকের (Executive)-এর সাপে(ও।

## ৪.৯ মুসলিম লিগের স্থাপনা

শি(িত মুসলিমদের মধ্যে এইসব সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদপন্থী প্রবণতার সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ ফল ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের পত্তন হল Aga Khan, ঢাকার নবাব এবং নবাব মোহসিন-উল মূলক-এর নেতৃত্বে। ১৯০৬ সালের পয়লা অকটোবর সিমলাতে Lord Minto'র কাছে এক স্মারকলিপিতে আলিগড়বাসী মুসলিম আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত( প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাল কারণ সাম্রাজ্যের র(ার জন্য তাদের অবদান। মুসলিম লিগ এইসময় বঙ্গ বিভাগকে সমর্থন করল, সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য বিশেষ র(াকবচ দাবি করল এবং ভাইসরয়ের কাছ থেকে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মতি আদায় করল। ত্র(মবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনকে খর্ব করার জন্য ব্রিটিশের হাতে লিগ হল প্রধান অস্ত্র। মুসলিম লিগের প্রশংসাকারীরা জাতীয়তাবাদীদের (এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের) এই দোষারোপকে ত্রে(াধমিশ্রিত ঘৃণার সঙ্গে অপমান করার চেষ্টা করত যে সমস্ত আন্দোলন (লিগের) টাই, ব্রিটিশ দ্বারা আয়োজিত এবং ''Command Performance''এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। (মহম্মদ আলি ১৯২৩ সালে কাকিনাড়া কংগ্রেস সিমলা প্রতিনিধিবর্গের সম্পর্কে প্রায়ই এই কথাটি প্রয়োগ করতেন)। 1880 সাল থেকে সৈয়দ আহমেদ গোষ্ঠী মুসলিমদের জন্য মনোনিত বিশেষ প্রতিনিধিদের কথা বলে আসছেন। এবং যতই নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে উঠল,

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি ততই জোরালো হল। এই ঘটনাবলির মধ্যে যদিও কিছু সত্য ছিল, তবুও সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্পর্কে ব্রিটিশের উৎসাহদান ছিল ''অনস্বীকার্য ঘটনা''। অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেন, ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং মুসলিম ও হিন্দু উচ্চ শ্রেণির সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের স্বার্থের ব্যাপারে একটা উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য ছিল, যা কিনা ''প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই'' মুসলিম লিগের দ্রুত সাফল্যকে ব্যাখ্যা করে। মুসলিম লিগ মুসলিম জনগণের কাছে গিয়ে তাদের নেতা হিসাবে দায়িত্ব নিল। কিছু আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম যদিও লিগের সঙ্গে সহমত ছিল না। প্রথমত উগ্র জাতীয়তাবাদী আহবার আন্দোলনের শি( ত ত(ণ মুসলিমেরা আলিগড়ের আনুগত্যের রাজনীতি (Loyalist politics) এবং বড়ো নবাব এবং জমিদারদের অপছন্দ করত। এই আন্দোলনের বড়ো নেতাদের মধ্যে মওলানা মোহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, হাসান ইমাম, মওলানা জাফর আলি খান এবং মাজহার-উল-হক উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত দেওবন্দ (Deoband) স্কুল পরিচালিত একশ্রেণির ঐতিহ্যশালী মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তি(ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রদর্শন করতেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপে( া উল্লেখযোগ্য হলেন, ত(ণ মওলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি কায়রোর আল আজহার (Al Azhar) বি(েবিদ্যালয়ে শি( ালাভ করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৯১২ সালে তিনি Al Hilal নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন যাতে তিনি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তবে, আজাদের মতো কিছু মানুষ বাদে অধিকাংশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মুসলিমই রাজনীতিতে আধুনিক ধর্মনিরপে( ভাবধারাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি।

ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্কে এমনকি মুসলিম লিগেরও মোহমুক্তি( ঘটল ১৯১১ সাল নাগাদ। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে পুনরায় ঘোষণা করলেন। মুসলিম রাজনীতিকদের উচ্চশ্রেণির কাছে এটা একটা বিরাট আঘাত। ''দিল্লিভিত্তিক মুঘল-মহিমা থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাতে মুসলিম মতামত প্রশমিত হল না এবং বস্তুতপ( ইতালীয় এবং বলকান যুদ্ধে (১৯১১-১২) তুরস্ককে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় তারা ব্রিটিশদের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হল। এছাড়া ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে আলিগড়ে মুসলিম বি(েবিদ্যালয়ের প্রস্তাব হার্ডিঞ্জ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে কানপুরে মসজিদ সংলগ্ন একটি মঞ্চকে (Platform) ভাঙ্গা নিয়ে দাঙ্গাও উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত ''ত(ণ তুর্কিরা'' ১৯১৩ সালে মুসলিম লিগের দখল নিল এবং দলকে অধিকতর উগ্রপন্থার দিকে চালিত করল। জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের সঙ্গে কিছু সমঝোতা আর ত্র(মবর্ধমান ইসলামবাদী অভিমুখে দল চালিত হল।'' ১৯১৩ সালের মার্চে মুসলিম লিগ এমনকি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল, যাতে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক স্বশাসন দাবি করাই তাদের ল( ্য বলা হল। এভাবে লিগ এবং কংগ্রেস সামরিকভাবে পরস্পরের কাছাকাছি হল।'' খিলাফত আন্দোলন এবং সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সহযোগিতার একটা পর্যায় আরম্ভের সূচনা হল।''

## ৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি


Amalesh Tripathi : The Extremist Challenge Calcutta 1967.

Sumit Sarkar : Swadeshi Movement in Bengal 1903-08, New Delhi 1979.

Bipan Chandra : Communalism in Modern India

Ram Gopal : Indian Muslisms — A political History (1858-1942) Bombay 1959.

## ৪.১১ Exercise

1. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে বিভিন্ন ঘটনার সাপে( ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করো।
2. জাতীয় তাত্ত্বিকরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কেমব্রিজের তাত্ত্বিকদের ধারণা সম্পর্কে কীভাবে প্রতিবাদ জানান? কীভাবে Marxist এবং Subalern (নিম্নবর্গীয়) ঐতিহাসিকেরা জাতীয়তাবাদীতত্ত্বকে সংশোধন করেন?
3. আদি কংগ্রেসের প্রকৃতির পরিমাপ কীভাবে করবে? নরমপন্থীদের পদ্ধতি কি ''সাধুবৃত্তি''?
4. ১৮৯০ সাল থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য তোমার মতে দোষী কে? মুসলিম বিভেদ পন্থা কি ব্রিটিশের ''divide and rule'' নীতির সহায়ক হয়েছিল?
5. বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জঙ্গি জাতীয়তাবাদ এর বৃদ্ধিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?
6. ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের কারণ এবং ফল কী?
7. স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলনের ধারা নির্ণয় করো।
8. কীভাবে ''স্বদেশী'' এবং ''বয়কট''কে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের আবাহন (Battle cry) বলা যায়।
9. মর্লি-মিন্টো সংস্কারের পিছনে কোন নীতিগুলি কী? এর সীমাবদ্ধতাগুলো কী ছিল?
10. ১৯০৬ সালে ভারতের মুসলিম লিগ গঠনের জন্য দায়ি, গু(ত্বপূর্ণ শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করো।

# ইতিহাস
## (স্নাতকোত্তর পাঠত্র(ম)
## তৃতীয় পত্র
## পর্যায়—২

## একক ১ ❑ ভারতীয় অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতিতে প্রথম বি(েযুদ্ধের প্রভাব

গঠন ঃ


১.১ ভূমিকা

১.২ অর্থনৈতিক প্রতিত্রি(য়া

১.৩ সামাজিক প্রতিত্রি(য়া

১.৪ রাজনৈতিক প্রতিত্রি(য়া

১.৫ ১৯১৭ সালেই মন্টেগু ভারত সফরে আসেন

১.৬ রাওলাট অ্যাক্ট

১.৭ দেশীয় শিল্পের উদ্ভব ও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থান

১.৮ ভারতীয় পুঁজির অনুপস্থিতির কারণ

১.৯ আঞ্চলিক বিভিন্নতা

১.১০ প্রথম মহাযুদ্ধকালীন অগ্রগতি

১.১১ অনুশীলনী

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী


## ১.১ ভূমিকা

১৯১৪ সালে জার্মানীর বি(দ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে যে প্রথম বি(েযুদ্ধের সূচনা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে অবধারিতভাবে ভারত তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যদিও যুদ্ধ ঘোষণার আগে ভারতীয়দের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হয় নি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ভারতের মানুষ ও সম্পদকে এই যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়( কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে ভারতীয়দের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। দশ ল( রও বেশি ভারতীয় বিভিন্ন রণ( ত্রে মিত্রশক্তি(র প( লড়াই করেন এবং বহু সহস্র প্রাণ হারান। ভারতের ১২৭ মিলিয়ন পাউন্ড এই যুদ্ধের জন্য ব্যয় হয় ভারতের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পায় ৩০ শতাংশ এবং এই চাপটা এসে পড়ে প্রধানত সাধারণ মানুষের উপর। তা সত্ত্বেও ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুদ্ধে ব্রিটিশ প( কে সমর্থন করেন। মনে মনে অনেকেই জার্মানীর বিজয় কামনা করলেও প্রকাশ্যে ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য দেখান ও সত্রি(য় সমর্থন করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে। প্রতিদানে স্বভাবতই তাঁরা আশা করেছিলেন যে, যুদ্ধান্তে শাসন সংস্কার করা হবে এবং ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। যুদ্ধের সময় মিত্রপ( র ঘোষণাতেও পদানত জাতিগুলির স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি ছিল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষে ভারতীয়দের মোহভঙ্গ হতে দেরী হল না। মৌখিক প্রতিশ্রুতি র( ার কোন ইচ্ছাই ব্রিটিশ শাসকদের ছিল না।

প্রথম বি(েযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) সকল অর্থেই ভারত ইতিহাসে এক নতুন দিক্‌নির্দেশক। অধ্যাপক সুমিত সরকার

মন্তব্য করেছেন—''The World War I brought about really crucial changes in the political life and socio-economic conditions of India.''

## ১.২ অর্থনৈতিক প্রতিক্রি(য়া

প্রথম বি(্বযুদ্ধ দেশবাসীকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। কারণ খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ফাটকাবাজী ও বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করে। বিশেষত কাপড়, ওষুধ, চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া হয়ে পড়ে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সর্বভারতীয় স্তরে মূল্যসূচক ছিল ১৯১৩ সালে ১৪৩, ১৯১৪ সালে ১৪৭, ১৯১৭ সালে ১৯৬ এবং ১৯২০ তে ২৮১। অংশত করবৃদ্ধি এবং অংশ পরিবহণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ভাঙনের ফলে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তাছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে ১৯১৮-১৯ এবং ১৯২০-২১ সালে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তদুপরি, যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য চালান দেওয়া হত। তাতেও খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। মোটা চাল, গম, বাজরার মূল্য ভয়াবহ রূপে বৃদ্ধি পায়।

কৃষিপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ কৃষকের কোন সুবিধা হয়নি। কেননা, ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক মহাজনদের কাছে স্বল্পমূল্যে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রী করতে বাধ্য হয়। ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুর খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি আহত হয়। আবার খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্যিক শস্যের (Cash-Crops) মূল্য সমহারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় ধনী কৃষকরা বি(ুব্ধ হয়ে ওঠে।

শিল্প শ্রমিক শ্রেণিও সমভাবে বি(ুব্ধ হয়ে ওঠে, যুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে শিল্পজাত জিনিসের আমদানী বন্ধ ছিল। তার ফলে এই সময় দ্রুত শিল্প বিস্তার ঘটে ও স্বভাবতই শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাগত দিক থেকে এরা ত্র(মশই গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের পর আবার বিদেশ থেকে জিনিস আসতে শু( করে। দেশের ভিতরেও বড়ো আকারে বিদেশী বিনিয়োগ হয়। এ সবের দ(ণ স্বদেশী শিল্প দা(ণভাবে ( তিগ্রস্ত হয়। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই হতে থাকে। প্রতিবাদে শ্রমিকরা লড়াকু মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য ধর্মঘট হয়। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে দাঁড়ায়।

যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সংকট ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের উপরও যথেষ্ট পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করেছিল। বি. আর. টমলিনসনের হিসাব অনুযায়ী ১৯১৪ সালে ভারত সরকারকে ৮০,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য এবং ১,৩০,০০০ ভারতীয় সৈনিক ও যুদ্ধ কর্মীর ব্যায়ভার বহন করতে হয়। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ভারত সরকারকে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য ও ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। লর্ড বার্কেন হেড মন্তব্য করেন—''Without India, the war would have been immensely prologed, if inded without her help it would have been brought to a victorious conclusion''। এর জন্য ভারতের প্রতির(া খাতে ব্যয় ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যয় বৃদ্ধির চাপ শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। নানাভাবে করভার বৃদ্ধি করা হয়। দা(ণভাবে ভূমি রাজস্ব, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি পায়, আয়কর চালানো হয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অবিভক্ত( হিন্দু পরিবারের উপর। তাছাড়া, প্রায় বাধ্যতামূলক যুদ্ধ ঋণ চালু করা হয়।

সব কিছু মিলিয়ে, প্রায় সমস্ত শ্রেণি মহাযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

## ১.৩ সামাজিক প্রতিত্রি(য়া

১৯১৪ সাল থেকে প্রধানত গ্রামাঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীর জন্য বাধ্যতামূলক সংগ্রহ (recruitment) শু( হয়। এর বি(দ্ধে সমাজে ত্র(মশই প্রতিবাদ ধূমায়িত হয়ে থাকে।

যুদ্ধ শেষে দূর দূর যুদ্ধ প্রান্তর থেকে যে সব সৈন্যরা দেশে ফিরে এসেছিল, তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল নতুন যুগের উন্মাদনার সংবাদ। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাংলার কবি কাজী নজ(লের নাম যিনি সমাজতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক ভাবধারার প্রথম উদ্বোধিত হন মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ প্রান্তর( ে্র।

শি( ত সম্প্রদায় বিশেষত যুবকদের মধ্যে যুদ্ধের মারণলীলার ফলে পাশ্চাত্যের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার প্রতি মোহভঙ্গ হয়। বি্বের নানা প্রান্তে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সব আন্দোলন শু( হয় তাও তাদের উদ্দীপ্ত করে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং বলশেভিকবাদের সাফল্যের সংবাদ ঘুরপথে ভারতে এসে পৌঁছলে জগৎ পরিবর্তনের স্বপ্ন জোরদার হয়ে ওঠে যদিও কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে ধারণা তখনও ছিল অস্পষ্ট।

## ১.৪ রাজনৈতিক প্রতিত্রি(য়া

যুদ্ধজনিত বিশেষ অর্থনৈতিক চাপের মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর কাছে কিছুটা দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। ভারতীয়দের বিশেষত শি( ত ও রাজনৈতিকভাবে সরব অংশকে খুশী করার তাগিদে কিছু (মতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালেই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বি(দ্ধে (োভ ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকতর দাবী জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। 'মডারেটরা' জাতীয় রাজনীতি( ে্র ত্র(মশই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন, ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঘোষিত ল্ৌ চুক্তি( দ্বারা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানায়( হোম(ল আন্দোলন ত্র(মশই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে বিশেষত হোম(ল লীগ নেত্রী অ্যানি বেসান্তের গ্রেফতারের (এপ্রিল, ১৯১৭) তা তীব্র আকার ধারণ করে।

তৎকালীন ভাইসরয় উদারনৈতিক লর্ড চেমসফোর্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার জন্য সওয়াল করেন। ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহল এই দাবীর সারবত্তা স্বীকার করলেও এই (মতার হস্তান্তরকরণ বহুবিধ বিষয় সযত্নে বিবেচনাপূর্বক ধীরে ধীরে করার প( পাতী ছিলেন। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধারও তারা বিরোধী ছিলেন। আর এক বিখ্যাত উদারনৈতিক এডুইন মন্টেগু ভারতসচিব হিসাবে দেখা দেবার পর হাউস অফ কমন্স-এ এক ঘোষণায় (আগস্ট, ১৯১৭) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতে এক দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্য ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন অধিকার দিতে নীতিগতভাবে স্বীকৃত হন। নিঃসন্দেহে এই ঘোষণা ঐতিহাসিক যদিও তার কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

## ১.৫ ১৯১৭ সালেই মন্টেগু ভারত সফরে আসেন

মন্টেগু ও চেমসফোর্ডের যৌথ রিপোর্টের (১৯১৮) ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে নতুন শাসনসংস্কার আইন চালু করে তা মন্ট-ফোর্ড-সংস্কার বলে পরিচিত।

এই শাসন সংস্কারের দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে (মতা ও আয় সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেশর(া, রেলপথ, মুদ্রা, পররাষ্ট্রনীতি, শুল্ক, ডাকব্যবস্থা প্রভৃতি গু(ত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অপরপ(ে, প্রাদেশিক সরকাগুলির হাতে আইনশৃঙ্খলা র(া, পুলিশ, শি(া, স্বাস্থ্য, কৃষি, রাজস্ব প্রভৃতি দায়িত্ব দেওয়া হয়।

**কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ (Central Executive Council) :**

নতুন সংস্কার আইন অনুযায়ী সাতজন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হয়। সাতজন সদস্যের মধ্যে অন্তত তিনজন সদস্য হবেন ভারতীয়। কার্যনির্বাহী শাসন পরিষদের সাহায্যে বড়লাট নিজ দায়িত্বে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। তিনি ভারতসচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, ভারতীয় আইনসভার কাছে নয়।

**কেন্দ্রীয় আইনসভা (Central Legislature) :**

কেন্দ্রে দ্বিক( বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চক(ে (বা Council of State) ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৬ জন বড়লার্ট কর্তৃক মনোনীত এবং বাকী ৩৪ জন সদস্যকে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নক(ে র (Legislative Assembly) ১৪০ জন (পরে ১৪৬ জন) সদস্যের মধ্যে ৪০ জন মনোনীত এবং ১০০ (পরে ১০৬) জনকে নির্বাচন করার ব্যবস্থা। উভয়ক(ে ই সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। শুধু মুসলিম নয়, (পাঞ্জাবে) শিখ ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের আলাদা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে (মতা বণ্টিত হলেও, কেবল কেন্দ্রীয় আইনসভাই সারা ভারতের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারত। কোন কোন বিষয়ে আইন সংত্র(ান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে বড়লাটের অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য ছিল। বড়লাট ভেটো প্রয়োগ করে যে কোন আইন প্রণয়ন বন্ধ রাখতে পারতেন। এছাড়া, বড়লাট অর্ডিন্যান্স বলেও আইন প্রণয়ন করতে পারতেন।

**প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন (Dyarchy) :**

প্রদেশগুলিতে এক ক( বিশিষ্ট আইনসভা স্থাপিত হয়। আইনসভা সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন নির্বাচিত এবং ৩০ জনকে গভর্নর কর্তৃক মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলির দায়িত্ব সংর(িত (reserved) এবং হস্তান্তরিত (transfered) বিষয় এই দুই ভাগে বিভক্ত( করা হয়। আইনশৃঙ্খলা, পুলিশ, সাধারণ প্রশাসন, অর্থ, বিচার, শ্রম প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল সংর(িত। এইগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল প্রাদেশিক গভর্নর ও তাঁর কার্যনির্বাহী সভার উপর। কার্যনির্বাহী সভায় ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের হার ছিল আনুপাতিক। অপরপ(ে, শি(া, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি অপে(াকৃত কম গু(ত্বপূর্ণ এবং দপ্তরগুলির আর্থিক বরাদ্দ কম অথচ জনসাধারণের প্রত্যাশা বেশি সেগুলি ছিল ''হস্তান্তরিত'' বিষয় এবং এগুলি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক মন্ত্রীদের উপর। তাঁরা আইনসভার কাছে তাঁদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। এইভাবে ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন প্রাদেশিক (ে(ত্রে দ্বৈত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

**সমালোচনা**

যুদ্ধোত্তরকালে স্বায়ত্তশাসনের যে স্বপ্ন ভারতীয় দেখেছিলেন, মন্ট-ফোর্ড সংস্কার আইন পাশ হলে দেখা গেল যে ভারতীয়দের অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস এই সংস্কার আইনকে তুচ্ছ, বিরক্তি(কর ও নৈরাশ্যজনক (inadequate, unsatisfactory and disappointing) বলে অভিহিত করেন। অ্যানি বেসান্ত একে দাসত্বের পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেন। এম. এ. জিন্না মুসলিমদের স্বতন্ত্র ভোটাধিকার প্রাপ্তির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, প্রাদেশিক আইনসভায় বিদেশি পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিদের মনোনীত সদস্য হিসাবে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোনভাবেই (ুণ্ণ না হয়। একমাত্র মডারেটরাই এই সংস্কার আইন সমর্থন করেন। কংগ্রেসের ভিতর সংখ্যাল্প হওয়ার দ(ণ তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া গঠন করেন। তবে এই সংস্কার আইনের সামান্য ভাল দিকও ছিল। প্রথমত, প্রথম প্রত্য( নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়া এবং দ্বিতীয়ত, ভোটাধিকারের কিছুটা সম্প্রসারণ। এর ফলে এক বিরাট সংখ্যক ভোটদাতা সুযোগ পায় যদিও তা মোট প্রাপ্তবয়স্কের এক (ুদ্র অংশমাত্র। তাছাড়া, প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা আইনসভার কাছে দায়ী থাকায় দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার সূচনা হয় এবং ভারতীয়রা সংসদীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের কিছু পরিমাণ সুযোগ পান।

কোন কোন ঐতিহাসিক এই আইনের মধ্যে ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও অব-উপনিবেশনায় (decolonisation) প্রক্রি(য়ার প্রথম স্তর দেখতে পেয়েছেন। বিপরীত মে(তে কিছু ঐতিহাসিক এই আইনের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ র(ার জন্য তার অনুকূল্যে প্রভাবশালী অংশকে টেনে আনার সুচতুর কৌশলের উল্লেখ করেছেন। আবার, কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও ভারতীয় সহযোগী সন্ধানের তাগিদ ঔপনিবেশিক সরকারকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

## ১.৬ রাওলাট অ্যাক্ট

১৯১৭ সালে বিচারপতি এম. এ. ইট. রাওলাটের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালের পর থেকে ভারতে যেসব সন্ত্রাসবাদী বিপ্-বী কাজকর্ম হয়েছে তা পর্যালোচনা ও দমনের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। এটি সিডিশন কমিটি নামে পরিচিত। আসলে অর্থনৈতিক সংকটজনিত পরিস্থিতিতে এবং স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী পূরণ না হওয়ায় গণমানসে যে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, তার থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যে সহজ ব্যাপার হবে না তা বুঝতে সরকারের বাকী ছিল না। এই বি(োভ দমন করতে দরকার ছিল কঠোর স্বৈরাচারী (মতা। এই উদ্দেশ্যেই রাউলাট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদ ও রাজদ্রোহ দমনের নামে দুটি বিল উত্থাপিত হয় (মার্চ, ১৯১৯)। এই দুটিই একত্রে রাউলাট অ্যাক্ট নামে পরিচিত এই আইনের ধারাগুলি হল

(১) সরকার বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বলে সন্দেহ করলে যে কোন ব্যক্তি(কে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল বন্দী করে রাখা যাবে।

(২) যে কোনো ব্যক্তি(র গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে।

(৩) যে কোনো ব্যক্তি(র বাড়ী বিনা পরোয়ানার তল্লাসী করা যাবে।

(৪) জুরীদের বাদ দিয়ে বিশেষ আদালতে রাজনৈতিক মামলার বিচার করা যাবে।

(৫) এই আদালতের রায়ের বি(দ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল করা যাবে না।

(৬) এই আইনের বলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই আইনের বি(দ্ধে সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

**উপসংহার ঃ**

একদিকে ১৯১৯ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সীমাবদ্ধতা ও রাউলাট অ্যাক্টের মত কালা আইন এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক অসন্তোষ—এই দুয়ে মিলে প্রথম বি(্বযুদ্ধোত্তর ভারতে গণআন্দোলনের যুগ শু( হল। আবির্ভাব ঘটল সর্বভারতীয় রাজনীতি। (ে ত্রে এক নতুন ব্যক্তি(ত্ব— মোহনদাস কমরচাঁদ গান্ধী ও তাঁর সঙ্গে এক নতুন যুগের।

## ১.৭ দেশীয় শিল্পের উদ্ভব ও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থান

**ভূমিকা ঃ**

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেলপথ প্রবর্তন ও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ফলে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর বৃহদায়তন শিল্পের প্রথম প্রবর্তন ঘটে। অধিকাংশ শিল্পই ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এইসব শিল্পগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত( করা যায়(— (১) বাগিচা শিল্প (চা, কফি, রবার ও নীল)( (২) পাটকল( (৩) খনি( (৪) ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য কলকারখানা।

এর পাশাপাশি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ আকারে ঊনিশ শতকের শেষের দিক থেকে কয়েকটি (ে ত্রে ভারতীয় পুঁজির আবির্ভাব ল(্য করা যায়। পশ্চিম-ভারতের পার্সি ও গুজরাটি সম্প্রদায়, রাজস্থানের মাড়োয়ারি, উত্তর-ভারতের ভাটিয়া ও দ(িণ-ভারতের টেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের বাণিজ্য ও মহাজনি সূত্রে হাতে সঞ্চিত প্রচুর অর্থ ছিল। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এইসব পুঁজিপতি সম্প্রদায়ই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা নেয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তার খাপখাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। পুরনো বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির জীর্ণদশা উপস্থিত হলে নতুন মেট্রোপলিটান বন্দর শহর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতার অর্থনৈতিক জীবনে তারা যুক্ত( হয়। উদীয়মান ভারতীয় শিল্পপতিশ্রেণির সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সম্পর্ক গোড়ার দিকে শত্রুতামূলক ছিল না। বরঞ্চ তারা ব্রিটিশ পুঁজি ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তিতাকারীর (middleman) ভূমিকা পালন করে।

যে শিল্পে দেশীয় পুঁজির সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ ঘটেছিল তা হল সূতীবস্ত্র শিল্প। অধিকাংশ সূতাকলই ছিল পশ্চিম-ভারতে অবস্থিত। ১৮৫৩ সালে পার্শি শিল্পপতি কাউসাজী নানাভাই দাভর বোম্বাইতে প্রথম সূতাকল স্থাপন করেন। ১৮৬০ সালে বোম্বাইতে সূতাকলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় দশ। ১৮৫৯ সালে রণছোড়লাল ছোটেলাল আমেদাবাদে প্রথম সূতাকল স্থাপন করেন। ১৮৮৭ সালে নাগপুরে জে. এন. টাটা কর্তৃক এমপ্রেস কটন মিলের প্রতিষ্ঠা আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শোলাপুর, সুরাট এমনকি উত্তর ভারতের কানপুরেও সূতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়। রেলপথের সম্প্রসারণ ও সরকারের অনুকূল ট্যারিফ নীতি এই শিশুশিল্পকে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। চীনে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের ত্র(মবর্ধমান চাহিদা ও স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এই শিল্পের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

সূতাকলের সংখ্যা ১৮৭৯ সালে ৫৬, ১৯০৫ সালে ২০৫-এ পৌঁছায় এবং প্রায় দু ল( শ্রমিক এতে কর্মরত ছিল। অধ্যাপক এম. ডি. মরিসের হিসাব অনুযায়ী ১৯১৩ সালে বি( বাজারে ভারত ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম সূতীবস্ত্রের রপ্তানীকারক।

সূতীবস্ত্র ছাড়াও, ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের চা শিল্প, অভ্র ও কয়লাখনি, জাহাজ নির্মাণ, রাসায়নিক শিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি (ে ত্রে দেখা গিয়েছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল এবং মীর্জা ইস্পাহানির মত ভারতীয় পুঁজিপতিরা চা শিল্পে বিনিয়োগ করেছিলেন। জয়চাঁদ সান্যাল ও মতিলাল শীলের উদ্যোগ প্রথম ভারতীয় চা কোম্পানী দ্য জলপাইগুড়ি টী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৮৭৮ সালে।

১৮৯৭ সালের এক সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩১১-টি অভ্রখনির মধ্যে ৬৯টি ছিল ভারতীয় মালিকাধীন। সব অভ্রখনিই ছিল হাজারীবাগ জেলার কোডার্মা অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে ৪৬টিই ছিল বাঁকুড়া-বিষু(পুরের সাহানা পরিবারের মালিকাধীন।

বিখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী স্যার পি. সি. রায় দেশীয় পুঁজিপতিদের সাহায্যে ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর পত্তন করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৯০৬ সালে বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা ও মাদ্রাজের বণিক চিদাম্বরণ পিল্লাই দ্য স্বদেশী স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাহাজ নির্মাণ ও পরিবহণ শিল্পের পাঁচ শতাংশ মূলধন ছিল ভারতীয়দের হাতে।

ভাল সংখ্যক কয়লাখনিও ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের কার, টেগোর এন্ড কোম্পানী কয়লাখনিতেও বিনিয়োগ করে। ঊনিশ শতকের শেষের দিকের একটি সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী, রানীগঞ্জ অঞ্চলে ৪০টি এবং ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের ৬২টি ছোট কয়লাখনি ভারতীয়দের হাতে ছিল। ঠিক প্রথম মহাযুদ্ধ শু( হবার পূর্বাহ্নে( এই ছোট খনিগুলির মালিকরা ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন গঠন করেন।

ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের তীব্র বাধা দান সত্ত্বেও ইঞ্জিনীয়ারিং ও ভারী শিল্পেও ভারতীয়রা কিছু বিনিয়োগ করেছিল। ১৮৬৭ সালে কিশোরীলাল মুখার্জী হাওড়ার শিবপুরে আয়রন কাউন্ড্রি স্থাপন করেন যেখানে কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি হত। ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ার মার্টিন এবং বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার স্যার রাজেন মুখার্জী মিলিতভাবে মার্টিন এন্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানী (পরবর্তীকালে নাম হয় মার্টিন বার্ন এন্ড কোম্পানী) কালত্র(মে ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীতে পরিণত হয়। ইউ. পি. তে নন্তল কিশোর ল(ৌ আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠান করেন।

১৯০৭ সালে জামশেদপুরে টাটা আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের ইস্পাত শিল্পে এক যুগান্তর আসে। এটির মূল পরিকল্পনা ছিল স্যার জামশেদজী টাটার। ১৯১১ সাল থেকে নিয়মিত উৎপাদন শু( হয় এবং ১৯১৪ সালে প্রথম বিশুদ্ধ ইস্পাত তৈরি হয়। এই কারখানা স্থাপনের আগে জামশেদজী ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ঝরিয়ায় উচ্চমানের কয়লা ও ময়ূরভঞ্জে আকরিক লৌহের সন্ধান পান।

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-০৮) দেশীয় শিল্পে এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসে। অনেকগুলি নতুন সূতাকল স্থাপিত হয়, যার বেশ কয়েকটি ছিল পূর্ব-ভারতে। এছাড়া নতুন নতুন নানা (ে ত্রে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ দেখা যায় যেমন হোসিয়ারী, সাবান, চিনি, নুন, তেল, দেশলাই, চর্মজ দ্রব্য, কাগজ, গ-াস, সিমেন্ট ও ঔষধ শিল্প। এগুলির মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক উদ্যোগই দীর্ঘস্থায়ী ও বাণিজ্য সফল হয়। তা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পের বৈচিত্র্যীকরণে এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়

প্রথম ভারতীয় শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা রমেশচন্দ্র দত্ত। পাশাপাশি, লর্ড কার্জনের আমলে এই একই সময় কেন্দ্রীয় সরকারে একটি পৃথক শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর স্থাপিত হয়। তার ফলেও শিল্পায়নে উৎসাহ এসেছিল।

## ১.৮ ভারতীয় পুঁজির অনুপস্থিতির কারণ

এসব সত্ত্বেও অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারত শিল্পে অত্যন্ত পশ্চাদপদ ছিল এবং এই ছোট শিল্পে( ত্রও প্রায় পুরোপুরি ব্রিটিশদের প্রাধান্যধীন ছিল। ভারতীয় পুঁজির ভূমিকা ছিল যৎসামান্য। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা নানাভাবে ভারতীয়দের এই অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

দাদাভাই নৌরজী ও গোখলের মত প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতীয় উদ্যোগের অভাবকে প্রধানত সঞ্চিত পুঁজির অভাব হেতু বলে মনে করতেন।

আবার অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিলের মতে ভারতীয়দের নতুন আবিষ্কারের ইচ্ছার অভাব ও ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুকতাই শিল্পে পশ্চাদগামিতার কারণ। যাদের হাতে নগদ অর্থ সঞ্চিত হল, তারা শিল্পে বিনিয়োগ করতে ভয় পেত, বরঞ্চ জমিদারী কেনার মত যেসব ( ত্রে নিশ্চিত আয়ের সুযোগ ছিল সেখানেই তারা বিনিয়োগ করত।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই দুটির কোনটিকেই প্রধান কারণ বলে গণ্য করেন না। অধ্যাপক অমিয় বাগচী সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে ভারতীয় উদ্যোগের প্রধান বাধা ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি। তারা ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী ও শিল্পপণ্যের বৃহৎ বাজার হিসাবেই দেখতে চেয়েছিল। নানাভাবে তারা বাধাদানের চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় শিল্পগুলিকে লাইসেন্স দেওয়ার ( ত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়( অধিকাংশ ব্যাঙ্ক বিদেশী নিয়ন্ত্রণে থাকায় ভারতীয়দের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া অসুবিধা হত এবং পেলেও চড়া হারে সুদ দিতে হত এবং নানা ধরনের কাগজপত্র ও জামিন দিতে হত।

যে কোনো শিল্পায়নের গোড়ার দিকে প্রাথমিক শর্ত হল সংর( ণের সুযোগ দেওয়া( কিন্তু অধিকাংশ নতুন ভারতীয় শিল্পকেই সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত জিনিসের উপর কোনো শুল্ক বসানো হত না( ভারতীয় পণ্যের উপর ধার্য করা শুল্কের ( ত্রেও কোন ছাড় দেওয়া হত না।

পরিবহণ ব্যয়ের ( ত্রেও বৈষম্য করা হত। আমদানীকৃত জিনিসের ( ত্রে রেলওয়ে ট্যারিফ কম করে ও দেশীয় পণ্যের ( ত্রে বেশি করে ধার্য করা হত।

কারখানায় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র ইংল্যান্ড থেকে চড়া শুল্ক দিয়ে আমদানী করতে হত কিন্তু ইউরোপীয়দের ( ত্রে সামান্য হারে শুল্ক ধার্য করা হত।

## ১.৯ আঞ্চলিক বিভিন্নতা

ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ ও ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণির উদ্ভবের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল তার আঞ্চলিক বিভিন্নতা। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল পশ্চিম ভারত বিশেষত বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং তা মূলত সূতীবস্ত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান ছিল।

শিল্পায়নে বড়ো ভূমিকা ছিল পার্সি, গুজরাটি এবং মাড়োয়ারি বণিকদের যারা মূলত পশ্চিম ভারতবাসী ছিল এবং আকিং ও সূতীবস্ত্রের ব্যবসায় প্রভূত বিত্ত অর্জন করা। এই লভ্যাংশ দ্বারা সূতাকল ও অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ করে।

পশ্চিম ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষত ব্যাপক তুলা চাষ বস্ত্রশিল্পকে সাহায্য করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাও বস্ত্রশিল্পকে সাহায্য করে।

সর্বোপরি, বস্ত্রশিল্পের একটি বৃহৎ আভ্যন্তরীণ বাজার ছিল যার চাহিদা ছিল সুনির্দিষ্ট। কাজেই, বহির্বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার উপর এই শিল্পকে নির্ভর করতে হত না।

সন্দেহ নেই, বস্ত্রশিল্পকেও সরকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সাফল্য ল্যাংকাশায়ারের মিল মালিকদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাদের স্বার্থ র(ার জন্য বিলাত থেকে আনীত বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক সরকার তুলে নেয়। তার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সরকারী সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এই সবের ফলে কিছুটা অগ্রগতির পর ভারতীয় বস্ত্রশিল্প আর এগোতো পারেনি। আবার এটাও সত্যি যে বোম্বাই-এর ভারতীয় বণিক ও ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে অন্তত কিছুটা পরিমাণ কাজ চলা গোছের বোঝাপড়া ছিল। তুলনায় পূর্ব-ভারতে শিল্পে ভারতীয়রা পিছিয়ে পড়ার বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণ ছিল।

প্রথমত পশ্চিম ভারতের তুলনায় অনেক আগে পূর্ব-ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটে এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তি অনেক দৃঢ় প্রোথিত ছিল। তার ফলে পূর্ব-ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটিশরা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল।

তাছাড়া, পূর্ব-ভারতের দু'টি প্রধান শিল্প চা এবং পাট মূলত রপ্তানী নির্ভর ছিল এবং এদের বিশেষ দেশীয় বাজার ছিল না।

পূর্ব-ভারতের সম্পন্ন ও শি(িত শ্রেণি তুলনামূলকভাবে বেশি আগ্রহী ছিল জমিদারী কেনা, চাকুরি ও চিকিৎসা ও আইন ব্যবসার মত স্বাধীন বৃত্তিতে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী শিল্প(ে ত্রে বিনিয়োগ করেছিলেন তাঁরাও কারখানা স্থাপনের চাইতে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী আগ্রহী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামদুলাল সরকার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষের নাম করা যেতে পারে।

সর্বোপরি, পূর্ব-ভারতীয় পুঁজিপতি ও ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মধ্যে আদৌ কোন বোঝাপড়া ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব(ে ত্রে ইংরেজরা পথ (দ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্থানীয় মাঝারি ব্যবসায়ীরা গড়ে তোলে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স।

## ১.১০ প্রথম মহাযুদ্ধকালীন অগ্রগতি

সামগ্রিকভাবে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সূতাবস্ত্র এবং কয়েকটি ছোট-খাট (ে ত্র বাদ দিলে ভারতীয় উদ্যোগীদের তেমন কোনো ভূমিকাই ছিল না। মৌলিক ও ভারী শিল্পের অভাবে ভারতে শিল্প অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে (১৯১৪-১৮)।

বস্তুতপ(ে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের ধারাবাহিক ইতিহাস শু( হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে। যুদ্ধের সময়ে ভারতে বিদেশ থেকে আমদানী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়( কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু জিনিসের বাড়তি উৎপাদন দরকার হয়। এই চাহিদা মেটানোর জন্য ভারতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্বভাবতই ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতিমহল এর সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। ব্রিটিশ সরকারও এই সর্বপ্রথম তাদের নানাবিধ উৎসাহ ও সুযোগ দিতে এগিয়ে আসে।

১৯১৫ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের পর সরকার ভারতের শিল্প সম্ভাবনাকে উন্নত করার জন্য একটি আত্মসচেতন ও সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করবে। এরপর ১৯১৬ সালে সরকার স্যার টমাস হল্যান্ডের নেতৃত্বে একটি শিল্প কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন ভারতে শিল্প প্রসারের জন্য সরকারকে ''উৎসাহব্যঞ্জক হস্তে( প'' নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেয়। অন্যান্য গু(ত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির মধ্যে হল—(১) সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক ভিত্তিতে পৃথক শিল্পবিভাগ স্থাপন( (২) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ( (৩) কারিগরী শি( ার প্রসার ইত্যাদি। ১৯১৮ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টেও ভারতে শিল্প বিকাশের জন্য সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। ইতিমধ্যেই সরকার শুল্ক সংর( ণ নীতি গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পকে পুন(জ্জীবিত করার নির্দেশ দেন। ভারত সরকার আমদানী শুল্কের হার শতকরা ৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৭.৫ ভাগ ধার্য করে (১৯১৬)। চিনিশিল্পকে উৎসাহ দিতে আমদানী করার চিনির উপর ১০% শুল্ক চাপান হয়। লোহা ও ইস্পাতের উপরও বাড়তি আমদানী শুল্ক বসান হয়।

পরিবর্তিত অবস্থায় ভারতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটে দ্রুত। এই প্রথম ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রভূত লাভের মুখ দেখলেন বিশেষ করে ইস্পাত ও সূতীবস্ত্রের (ে ত্রে। বহু নতুন শিল্পপতিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় এবং পুরনো শিল্প গোষ্ঠীগুলি আরো শক্তি(শালী হয়। বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে দেশীয় পুঁজিপতিদের যৌথ মালিকানা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়। বহু ব্রিটিশ শিল্পপতি সামরিকবাহিনীর কাজে চলে যাওয়ার শিল্পোদ্যোগ দেখাশোনা করতে না পারায় ভারতীয়দের সঙ্গে অংশীদারীত্বে আসেন।

ইস্পাত এবং সূতীবস্ত্রের (ে ত্রে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপতিরা শিল্প বৃদ্ধির পুরো সুযোগ নিতে পানে নি। কেননা ভারতে যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানার অভাব ছিল এবং জাহাজের অভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকেও আমদানী করা যেত না। তাছাড়া, অধ্যাপক অমিয় বাগচী মনে করেন যে, সংর( ণ নীতি সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পের সুষম বিকাশ ঘটেনি। এর কারণ হল সরকারের সংর( ণ নীতি সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট ছিল না। যুদ্ধের শেষের দিক থেকেই উৎপাদন কমতে থাকে। ভারতীয় শিল্পপতিদের দাবী ছিল আরো বেশী সংর( ণ ও রাষ্ট্রীয় সাহায্যের। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বিজয়ী শক্তি( ব্রিটেন ভারতীয় অর্থনীতির অনুকূল এই দাবী মেটাতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

যুদ্ধ শেষে দৃঢ়প্রত্যয়ী ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং যুদ্ধের সময়ে হৃত জমি পুন(দ্ধারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণির মুখোমুখি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

## ১.১১ অনুশীলনী

**রচনাধর্মী প্র( ঃ**

১। ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজজীবনে প্রথম বি(্বযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা কর।

২। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার (ে ত্রে সত্যই কতটা পরিবর্তন এনেছিল?

৩। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষপর্যন্ত দেশীয় উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের বর্ণনা দাও।

**সং( প্ত প্র( ঃ**

১। রাওলাট অ্যাক্ট বলতে কী বুঝ?

২। ভারতে শিল্পায়নের প্রথম যুগে ভারতীয় পুঁজির অনুপস্থিতির কারণ কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৩। ভারতে শিল্পায়নের আঞ্চলিক বিভিন্নতার কারণ কী?

**বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে শেষ হয়?

২। মন্ট-ফোর্ড বলতে কাদের বোঝায়?

৩। রাওলাট কে ছিলেন?

৪। বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

৫। স্যার জামশেদজী টাকা কেন বিখ্যাত?

## ১.১২ গ্রন্থপঞ্জী


১। ত্রিপাঠী অমলেশ— স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭ (আনন্দ পাবলিশার্স)।

২। Sarkar Sunil—Modern India, 1885-1947 (Macmillan) (Bengali translation available).

৩। Bandyapadhyay Sekhar— From Plassey to Partition : A History of Modern India (Orient Longman).

৪। Bagchi A. K.—Private Investment in India, 1900-39 (Cambridge University Press).

৫। Bipan Chandra, Mridula Mukherjee and others—India's struggle for Independence (Bengali translation available).

# একক ২ ❑ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ

গঠন ঃ


২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ

২.৩ গান্ধীজীর দ(িণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা

২.৪ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন

২.৫ চম্পারণ সত্যাগ্রহ

২.৬ খেড়া সত্যাগ্রহ

২.৭ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ

২.৮ রাওলাট সত্যাগ্রহ

২.৯ অনুশীলনী

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী


## ২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে অপনি জানবেন ঃ—

- ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থানের প্রে(াপট।
- রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীর জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা লাভের কারণ।
- গান্ধীর আবির্ভাব ও প্রাথমিক আন্দোলনসূমহ।
- গান্ধীর সত্যাগ্রহ ও অহিংস আন্দোলনের আদর্শ।

## ২.২ ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ, কারণ ঐ বছরেই যথেষ্ট পরিণত বয়সে (৫০ বছর) গান্ধীজী ভারতের রাজনীতিতে সত্রি(য়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের বাইরে দ(িণ আফ্রিকায় ছিলেন। দ(িণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন শু( হয়। গোপালকৃষ( গোখলেকে তিনি রাজনৈতিক গু( বলে মনে

করতেন। গোখলেই তাঁকে ভারতবর্ষে নিয়ে এসে ভারতীয়দের সাথে পরিচিত করান। গোখলে বিশ্বাস করতেন যে, গান্ধীজী ভবিষ্যতে ভারতের নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা হবেন। তাঁর এই ধারণা গান্ধীজী সত্যে পরিণত করেছিলেন।

গান্ধীজীর পথ ছিল অন্যদের থেকে পৃথক। তিনি নরমপন্থী সহযোগিতার নীতি বর্জন করেন এবং চরমপন্থী অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত লক্ষ্যের ক্ষেত্রে তিনি বহুদিন নরমপন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর মতে, 'স্বরাজ'-এর অর্থ শুধু রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, রিপুর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই গান্ধীজীর কাছে প্রকৃত 'স্বরাজ'। অন্যদিকে তিনি নরমপন্থীদের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের আদর্শকে কোনদিন গুরুত্ব দেননি। সন্ত্রাসবাদীদের অভয়মন্ত্র ও অমরবীর্য দ্বারা তিনি প্রভাবিত হলেও কিন্তু হিংসা ও অসত্যের পথে স্বরাজ সাধনায় তাঁর আপত্তি ছিল। মার্কসবাদীদের মত তিনি সহিংস শ্রেণি সংগ্রামের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, সর্বব্যাপী গণসংগ্রামের যে পথ গান্ধীজী বেছে নিয়েছিলেন তার সাথে মার্কসবাদীদের একটা মিল ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ। দক্ষিণ আফ্রিকায় শেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র দিয়ে তিনি জয়লাভ করেছিলেন, অন্য সকলে স্বাধীনতার অর্থ যেভাবে করতেন, গান্ধী তা করতেন না। স্বাধীনতা অর্জন তাঁর কাছে ছিল বৃহত্তর ও মহত্তর একটি লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমমাত্র। ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা জন্ম দিয়েছে অর্থনৈতিক শোষণের এবং দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়া হয়েছে অসম্ভব। তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক প্রগতির প্রথম ধাপই হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা। গান্ধীর সংগ্রাম ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে, ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে নয়। অমর সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গান্ধীর মতাদর্শের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে লিখেছেন 'ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি (তিনি) বিশ্বাস হারাইয়াছেন, কিন্তু মানুষ ইংরেজদের আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে।'' গান্ধীজী মনে করতেন আমাদের জীবনধারণের জন্য সবকিছু প্রয়োজনীয়, তার জন্য পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বয়ম্ভর হতে হবে। এই জন্যই তিনি গ্রামীণ উন্নতির উপর জোর দিয়েছিলেন। চরকা ছিল এই স্বয়ম্ভরতার প্রতীক। গান্ধীজীর মতে, সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। সুতরাং ভালবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে শত্রুকেও বশ করা যায়। তাঁর রাজনীতিতে শ্রেণি সংগ্রামের কোন স্থান ছিল না। রাজনীতির এই মহৎ আদর্শ গান্ধী তুলে ধরেছিলেন, তা ছিল একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব।

রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সত্যাগ্রহের আদর্শ। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে, গান্ধীর কাছে অহিংসা বা সত্যাগ্রহের ব্যক্তিগত তাৎপর্য ছিল একটি গভীরভাবে অনুভূত এক প্রতীয়মানদর্শন। এমারসন, থোরো বা টলস্টয়-এর কাছে এব্যাপারে তিনি কিছুটা ঋণী হলেও কিন্তু এতে কিছুটা মৌলিকতাও লক্ষণীয়। সত্যের অনুসন্ধানই মানব জীবনের লক্ষ্য। পুরোপুরি সন্ত হিসাবে নয়, কিন্তু রাজনীতিক হিসেবে গান্ধীজী মাঝে মাঝে পূর্ণ অহিংসার সাথে কিছুটা আপসের পথ অবলম্বন করেছিলেন।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের দুটি দিক ছিল— একটি সত্যবাদিতা ও অপরটি অহিংসা। গান্ধীজীর সারা জীবনের সারাংশ হল সত্যের জন্য সংগ্রাম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শুদ্ধ তেজ বা শক্তি থাকে, গান্ধীজী যাকে বলেছেন সত্যের শক্তি এবং এই সত্যের শক্তির দ্বারা সবকিছু জয় করা যায় বলে তিনি মনে করতেন। গঠনমূলক কাজ ও অন্যায়ের প্রতিশোধক হিসাবে তিনি এই শক্তিকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

সত্যাগ্রহের মূল কথাই হলো অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগিতা। অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোষ সত্যাগ্রহী করে না। সত্যাগ্রহের আদর্শে উপনীত হবার পথ অহিংসা। অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকারের লক্ষ্য কিন্তু অন্যায়কারীর ওপর চাপ সৃষ্টি করা নয়, সহযোগিতার সমস্ত পথ বন্ধ করে তাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে বাধ্য করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। অহিংস আন্দোলনের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে গান্ধী বলেছেন যে, এর ফলে অন্যায়কারী এক উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে। যদি সে বলপ্রয়োগ করে কোন আন্দোলন দমন করতে যায়, তাহলে সে সাধারণের

নৈতিক সমর্থন হারায়, আবার সে যদি নিষ্(য়তা অবলম্বন করে তাহলে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং অন্যায়কারীর পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

গান্ধীজীর জীবনদর্শনের মূলে ছিল জন্মস্থান গুজরাটের জৈনধর্ম ও পারিবারিক বৈষ(ব প্রভাব। অপরদিকে ছিল বাইবেল, রাস্কিন, থোরো ও টলস্টয়ের প্রেরণা। শেষপর্যন্ত গীতাই তাঁর প্রধান আধ্যাত্মিক অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। Carlyle-এর **Heroes and Hero-worship** পড়ে তিনি মহাপু(ষদের মহত্ব, সাহসিকতা ও কঠোর জীবনাদর্শের কথা জানতে পারলেন। মার্কিন লেখক Henry David Thorean-র লেখা Civil Disobedience পড়েও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি লেখেন Hind Swaraj। তাতে সে বি(া বী(া ও জীবন দর্শনের সূত্র পাওয়া যায় শেষদিন পর্যন্ত তার মৌলিক পরিবর্তন হয়নি।

এই পুস্তিকায় যে মূল বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল তা ছিল, প্রকৃত শত্রু ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য নয়, বরঞ্চ সমগ্র আধুনিক শিল্পভিত্তিক সভ্যতা। গান্ধীজী মনে করতেন বস্তুবাদ থেকে জন্ম শিল্পবিপ-বের এবং শিল্পবিপ-ব জন্ম দেয় সাম্রাজ্যবাদের। এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়তে হলে তাঁর মতে সত্য ও প্রেমের শক্তি( অর্জন করতে হবে, যাকে তিনি বলেছেন অহিংসা।

জোয়ানবঁদুর তাঁর **'conquest of violence'** গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন গান্ধীজী সত্যাগ্রহকে কোন অপরিবর্তনীয় অন্ধ অনুশাসন বলে মনে করতেন না। সত্যাগ্রহ ছিল তাঁর কাছে নৈতিক সংগ্রামের ভূমিকা রচনার স্বাধীন পরী(া-নিরী(া।

সত্যাগ্রহ ও অহিংসার এই আদর্শ তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োগ করেন। নরমপন্থী-চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদের সকলের পথ ছেড়ে তিনি তাঁর নিজস্ব পথ গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর আবির্ভাব আকস্মিক। জাতি এর জন্য হয়ত প্রস্তুত ছিল না। তিনি জাতিকে তাঁর আন্দোলনের শরীক করে নিলেন। নেতৃত্বের (েত্রে একটা শূন্যতা থাকলেও গান্ধীর মধ্যে মানুষ আবিষ্কার করল এমন একজন ব্যক্তি(কে, যিনি একান্তভাবে তাদের কাছের মানুষ। তাঁর বাস্তব বুদ্ধির কাছে ইংরেজরা কখন কখন পরাজিত হয়েছে, আবার তাঁর সরল বি(াসের সুযোগও নিয়েছে। তাঁর সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা, ঋষিতুল্য ব্যক্তি(ত্ব( সাধারণ পোষাক অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সমর্থ হয়। সব থেকে বড়ো কথা তাঁর স্বার্থত্যাগ মানুষকে মোহিত করলেন। গান্ধীজীর আগমনের পূর্বের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে কবিগু( রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—''আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনো নিয়ে যেতেন আবেদন-নিবেদনের ডালা, কখনো বা করতেন চোখ রাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবেছিলেন তাঁরা যে, কখনো তী(্ন কখনো সুমধুর বাক্যবাণ নি(েপ করে তাঁরা ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির সমক( হবেন। সে (ীণ অবাস্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমাদের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রের স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত(''। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষায় ''তিনিই (গান্ধীজী) বোধহয় পৃথিবীর শেষ আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদী (তাঁর ভাষায় 'রামরাজ্যবাদী') যিনি খ্রিস্টের মত মাটির পৃথিবীতে ন্যায় ও প্রেমের রাজ্য ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং খ্রিস্টের মতই ত্রু(শবিদ্ধ হয়েছিলেন।''

## ২.৩ গান্ধীজীর দ(িণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্যারিস্টারি করার জন্য দ(িণ আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শু( হয়। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে গান্ধীজী ছিলেন একাধারে 'এলিটে'র ও জনগণের।

তাঁর ব্যক্তি(ত্ব এই দুই বিপরীত মে(কে এক বিন্দুতে গ্রথিত করেছিল। দ(িণ আফ্রিকায় তাঁর মক্কেলের মধ্যে ছিল ধনী বণিক থেকে দরিদ্র, চুক্তি(বদ্ধ শ্রমিক, হিন্দু ও মুসলমান। এখানে তিনি এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্মম অত্যাচার প্রত্য( করেন। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন গতির অনুসরণ করে এই অন্যায়ের বি(দ্ধে প্রতিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের গতির পরিবর্তন ঘটিয়ে অহিংস সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের পথ অনুসরণ করে তিনি সরকারকে বৈষম্যমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন। এই ঘটনা ছিল গান্ধীজীর জীবনে রাজনীতির হাতেখড়ি এবং দ(িণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা তাঁকে ভবিষ্যত আন্দোলনে পথ দেখিয়েছিল। দ(িণ আফ্রিকায় তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এর ফলে তাঁর একটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। দ(িণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তিনি হিন্দু মুসলিম মৈত্রীর গু(ত্ব অনুধাবন করেন। অস্পৃশ্যতার কুফল সম্পর্কেও তিনি সচেতন হন। দ(িণ আফ্রিকায় সংগ্রামে বহু মহিলা অংশ নিয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি মনে করেন রাজনৈতিক আন্দোলনেও মহিলাদের গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। G Forbes 'Women In Modern India' গ্রন্থে লিখেছেন যে, গান্ধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের গু(ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। 'Young India' গ্রন্থে গান্ধী বিভিন্ন সময়ে নারীদের গু(ত্ব আলোচনা করেছেন। এই সকল অভিনব অভিজ্ঞতা গান্ধীজীকে ভারতে সর্বভারতীয় নেতারূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেয়।

## ২.৪ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন

১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে আসার পর গান্ধীজী এক বছর প্রত্য( রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। এই সময় ভারত ভ্রমণ করে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। গান্ধীজী বুঝেছিলেন বর্তমান কংগ্রেস সত্যাগ্রহের আদর্শ মেনে নেবে না এবং কংগ্রেসের নেতারাও তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেবে না। তাই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষেরা যে সকল অন্যায়ের স্বীকার হচ্ছে তার বিরদ্ধে সত্যাগ্রহ নীতি পরী(া করে এবং এই নীতির সফলতা অর্জনের দ্বারা জনমত গঠনের চেষ্টা করলেন। সুতরাং এই সময়টিকে গান্ধীজীর অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি পথ বলা যেতে পারে। এই সময় তিনি যে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সেগুলির কেন্দ্র ছিল চম্পারণ (বিহার), কৈবর বা খেদা (গুজরাট) এবং আমেদাবাদে। প্রকৃতপ(ে ১৯১৯ সালে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বে গান্ধীজী এই সকল আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। ল(ণীয় তিনটি আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল রাজনীতিতে অপে(াকৃত অনগ্রসর ও অনুন্নত অঞ্চল এবং সমস্যাগুলির সাথে কোন সর্বভারতীয় বা জাতীয় স্বার্থ জড়িত ছিল না। বস্তুত জাতীয় নেতারা যখন আইনসভার সংস্কার ইত্যাদি সাংবিধানিক প্র(ে নিয়ে আলাপ-আলোচনায় রত, গান্ধীজী তখন সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায়, অবিচার, বঞ্চনা ও শোষণের বি(দ্ধে আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দান করে তিনি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে 'দেওতা' রূপে প্রতিপন্ন হন। তাঁর নামকে কেন্দ্র করে এক ধরনের মোহ তৈরি হয়। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল গান্ধীজীর charisma।

## ২.৫ চম্পারণ সত্যাগ্রহ

গান্ধীজী দ(িণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে পরী(ায় নেমেছিলেন, ভারতবর্ষে তাঁর সেই পদ্ধতিরই সর্বপ্রথম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হলো চম্পারণে কৃষকদের এই আন্দোলন।

বিহারের চম্পারণে নীলকর সাহেবরা 'তিন কাঠিয়া' প্রথায় কৃষকদের তাদের জমির প্রতি বিঘায় তিন কাঠা অংশে নীল চাষ করতে বাধ্য করতো। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রি(য়ায় কৃত্রিম উপায়ে নীল উৎপাদনের পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নীলের দাম কমে যাওয়ায় কৃষকরা নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে নীলের ন্যায্যমূল্য পেত না এবং নীল চাষ করে তাদের প্রচুর লোকসান হতে লাগল। এর ফলে কৃষকরা নীল চাষ করতে চাইল না। নীলকর সাহেবরা নীলের ব্যবসায়ে লোকসানের দায় কৃষকদের ওপর চাপাতে থাকে এবং নীলচাষ করতে বাধ্য করার জন্য কৃষকদের ওপর নানা নির্যাতন করে। সাহেবরা জমির খাজনা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। কৃষকরা এই বর্ধিত খাজনা দিতে অ( ম হলে, সাহেবরা জমির চাষ বন্ধ করার প্রস্তাব দেয়। এর ফলে ১৯০৫-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশেষ করে এই অঞ্চলে ব্যাপক কৃষি বি( োভ দেখা দেয়। ১৯০৮ সালে এই অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ নেয়। চম্পারণের কৃষক ও জোতদাররা শেষপর্যন্ত ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গান্ধীজীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করানো হয়। গান্ধীজী ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে চম্পারণে যান এবং স্থানীয় বুদ্ধিজীবী নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আচার্য জে. বি. কৃপালনীর সাহায্যে কৃষকদের উপর কি ধরনের জুলুম চলে তার অনুসন্ধান করে সত্যাগ্রহের সূচনা করেন। বাধ্য হয়ে সরকার নীল অনুসন্ধান কমিশন বসান এবং গান্ধীজী হয়েছিলেন এই কমিশনের একজন সদস্য। এর ফলে 'তিন কাঠিয়া' প্রথা তুলে দেওয়া হয়। খাজনার হারও শতকরা ২০ থেকে ২৬ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত নীলকর সাহেবরা জেলা ছেড়ে চলে যান। গান্ধী নীলকরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিলেন কারণ তাঁর মতে, নীলকরদের যেমন কৃষক ছাড়া চলবে না, তেমনি কৃষকদের কাছেও নীলকররা ছিল অপরিহার্য।

আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকেরা চম্পারণ কৃষক আন্দোলনে গান্ধী বা গান্ধী অনুগামীদের প্রত্য( ও গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিনা, তা নিয়ে প্র( তুলেছেন। কৃষক জমায়েত করার (ে ত্রে শহরতলীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গান্ধীপন্থায় দী( িত রাজেন্দ্র প্রসাদ, এ. এন. সিংহ, শি( ক জে. বি. কৃপালনী প্রমুখের যত না ভূমিকা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সক্রি(য় ভূমিকা নিয়েছিল নিচু স্তরের মধ্য কৃষকরা, অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে, চম্পারণ নীল চাষীদের অভিযোগ সম্পর্কে সর্বভারতীয় প্রচারের মধ্যেই গান্ধীজীর নিজস্ব ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীর ভূমিকা কতটুকু ছিল বা ছিল না তা নিয়ে সাধারণ কৃষকরা অবশ্য মাথা ঘামায় নি। বেতিয়ার মহকুমাশাসক লিউইল চম্পারণের জেলাশাসক জেককে লিখছেন, ''আমরা নিজ নিজ মতানুসারে গান্ধীকে আদর্শবাদী, ভাবোন্মাদ বা বিপ-বী ভাবতে পারি। কিন্তু রায়তদের কাছে তিনি মুক্তি(দাতা এবং তারা মনে করেন তাঁর আশ্চর্য সব (মতা রয়েছে''। জনৈক রায়ত গান্ধীকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যত( ণ গান্ধী আছেন, তত( ণ নীলকর রা( সদের ভয়ের কোন কারণ নেই। অবশ্য গান্ধীপন্থী সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো জঙ্গী ভাবের কিছু ল( ণ দেখা গিয়েছিল। যেমন, কয়েকটি নীলকুঠির ওপর আক্র(মণ ও আগুন লাগানোর ঘটনা। গান্ধীর আন্দোলনে কৃষকরা প্রায় আত্মনির্ভরতা ও প্রেরণা। তবে গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, চম্পারণ কৃষকদের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো— শি( া বিস্তার ও কৃষক ও নীলকরদের মধ্যে মধ্যস্ততা করার জন্য স্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে চম্পারণ আন্দোলন গান্ধীকে সর্বভারতীয় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দিল। শুধু নিম্নবর্গের মানুষই নয়, অনেক শি( িত মানুষও গান্ধীর ভক্ত( পরিণত হয়।

## ২.৬ খেড়া সত্যাগ্রহ

গান্ধীর হস্ত( েপের সাফল্য অনেক বেশী স্থায়ী প্রমাণিত হয় গুজরাটের খেড়া জেলায়। এখানে বড়ো জমিদার

ছিল না। অধিকাংশ জোতদারই ছোট, আর কুনবি জাতের পটিদার কৃষকরা ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয়ের চেয়ে বেশি শক্তি(মান। খেড়া বিষয়ে একটি অনুসন্ধান ডেভিড হার্ভিমান দেখিয়েছেন যে, এখানে একটি প্রান্ত উনিশ শতকীয় 'স্বর্ণযুগে'র শেষে ১৮৮৯ এরপর বারবার দুর্ভি( ও মড়ক হয়, ফলে রাজস্ব দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯১৭-১৮ সালে খাদ্য উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং কেরোসিন তেল, কাপড়, লবণ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় কৃষকেরা খাজনা বয়কটের নির্দেশ দেয়। সরকার এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। গুজরাট সভার সভাপতিরূপে গান্ধী বোম্বাই সরকারের হস্ত(েপ চাইলেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাজস্ব বন্ধের উদ্যোগ এসেছিল খেড়া-র কপোতভঞ্জ তালুকের মোহনলাল পাণ্ড্য-র মতো আঞ্চলিক নেতাদের তরফ থেকে। কমিশনার খাজনা মকুবের আবেদন এবং বোম্বাই-এর লাট অনুসন্ধানের অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর গান্ধী ১৯১৮-র ২২শে মার্চ সত্যাগ্রহ শু( করেন এবং ৬ই জুন পর্যন্ত সত্যাগ্রহ চলেছিল। দু' হাজারের মত সদস্য সে বছর খাজনা না দেবার শপথ গ্রহণ করেন। নবীন আইনজীবী বল্লভভাই প্যাটেল ও ইন্দুলাল যাজ্ঞিক-সহ কয়েকজন ত(ণ অনুচর নিয়ে গান্ধী গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে কৃষকদের কর বয়কট আন্দোলনে উৎসাহিত করতে থাকেন। কিন্তু নামমাত্র ছাড়ের চেয়ে বেশি কিছু না পেয়েই জুন মাসে এই সত্যাগ্রহ তুলে নিতে হয়। বস্তুত চম্পারণে তিনি যতটা সফল হয়েছিলেন এ(ত্রে সফলতা ততটা ছিল না। জুডিথ ব্রাউন লিখেছেন—''In Kaire (Khada) it led neighter to an independent enquiry nor to the suspension of revenue he had first demanded''।

খেদা জেলার কৃষকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন গান্ধীজী তথা গুজরাটের রাজনৈতিক বিবর্তনের (ত্রে এক গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে গুজরাটের কৃষক সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। জুডিথ ব্রাউন-এর মতে যদিও গান্ধীজী তখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত( ছিলেন না, তথাপি খেদা সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক কুশলতার সা( বহন করে। সর্বোপরি যেকোন পরিস্থিতিতে, শি(িত-অশি(িত নির্বিশেষে সবাই যে এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে, তা প্রমাণিত হয়।

## ২.৭ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ

১৯১৮-র ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এ আহমেদাবাদে যে পরিস্থিতিতে গান্ধী হস্ত(েপ করেন, সেটি ছিল একান্তভাবেই গুজরাটের মিল মালিক ও তাঁদের শ্রমিকদের মধ্যেকার সংঘর্ষ। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী ছিল মালিক-শ্রমিক প(ের বিরোধের মূল কারণ। যুদ্ধের ফলে আমেদাবাদের মিল মালিকদের কাছে বিশেষ লাভের সুযোগ আসে। ইউরোপ থেকে বিদেশী জিনিস আমদানিতে টান পড়ে। সেই সুযোগে স্থানীয় বাজারে ভারতে তৈরি জিনিসের চাহিদা বাড়ে। ফলে মিল মালিকদের মুনাফা বাড়লেও যুদ্ধের সময় সব জিনিসের দাম বাড়ায় শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট বাড়ে। এদিকে প্লে-গের আশঙ্কায় শ্রমিকরা যাতে পালিয়ে না যায় তার জন্য ১৯১৭ সালে বিশেষ বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা হলেও ১৯১৮ সালে প্লে-গের ভয় কেটে যাওয়ায় মিল মালিকেরা তা প্রত্যাহার করতে উদ্যোগী হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে (োভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে গান্ধীর সালিশির চেষ্টা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়। মড়কের বোনাসের পরিবর্তে শ্রমিকেরা ৫০% মজুরি বৃদ্ধি দাবি করেন এবং মালিকরা দিতে চান মাত্র ২০%। ফলে ১৯১৮-র মার্চে প্রথম অনশন ধর্মঘট শু( হয়। শ্রমিকরা যাতে মালিকদের বি(দ্ধে কোন হিংসাত্মক আচরণ না করেন, তিনি তাদের সেই উপদেশ দিতেন। যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, অনশন ধর্মঘট শ্রমিকদের মজুরি ৩৫% বাড়াতে সফল হয়।

১৯১০-র বস্ত্র শ্রমিক সভার মাধ্যমে আমেদাবাদে শ্রমিকদের ওপর গান্ধীর প্রভাব আরও সুসংহত হয়।

আমেদাবাদের ধর্মঘটে গান্ধী নিজেকেও যুক্ত( করেছিলেন। শ্রমিকদের দাবির প্রতি, শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য তিনি যেভাবে অনশন করেছিলেন এবং পরে গড়ে ওঠা ইউনিয়নকে যেভাবে পরিচালিত করেছিলেন তাকে সুপরিচিত ''গান্ধীপন্থী শ্রমিক সংগঠনের'' সূচনা বলে অভিহিত করা যায়।

চম্পারণ ও খেদার আন্দোলনের সঙ্গে আমেদাবাদ মিল শ্রমিকদের আন্দোলনের পার্থক্য ছিল। প্রথম দুটি আন্দোলন ছিল কৃষক আন্দোলন। আমেদাবাদ আন্দোলনে গান্ধী প্রথম শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান। এখানেই তিনি আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে প্রথম অনশন করেন। গান্ধী নিজে অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর অনশনের কারণ ছিল, যেসব শ্রমিক সত্যাগ্রহের আদর্শ থেকে সরে আসছিল, তাদের সংশোধন করা। মার্কসবাদীদের মত তিনি মালিক-শ্রমিক শ্রেণি সংঘর্ষের তত্ত্বে বি(াসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন উভয়ের মধ্যে উভয়ের সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতার।

এইসব সংগ্রাম আংশিকভাবে সফল হলেও সেই সাফল্যই গান্ধীকে সারা ভারতের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। জনগণ পরিচিত হলো গান্ধী আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে। তারা পেল এক নতুন পথের সন্ধান। ভারতের মানুষদের সামনে যেসব সমস্যা হাজির হতো, সেগুলির সমাধানের জন্য সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করতেন তিনি, যা নিয়ে তিনি পরী(া করেছেন দ(িণ আফ্রিকায়, চম্পারণে, খেদায় ও আমেদাবাদে। তিনি তাঁর রাজনৈতিক ত্রি(য়াকাণ্ডের কার্যসূচী থেকে গোখলের নরমপন্থী ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়েছিলেন প্রারম্ভিকপর্বে যে গোখলেকেই তিনি নিজের রাজনৈতিক গু(রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। এরই মধ্য দিয়ে তিনি তিলকের র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনকে সরিয়ে তার জায়গায় সমগ্র ভারতব্যাপী এক নতুন গণসংগ্রামের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রতিষ্ঠাতা অগ্রনায়করূপে নিজেকে উপস্থাপিত করেন।

## ২.৮ রাওলাট সত্যাগ্রহ

চম্পারণ, খেদা ও আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ আংশিক সাফল্যের পর গান্ধীজী চাইলেন সর্বভারতীয় কোন দাবিতে সত্যাগ্রহ নীতির প্রয়োগ সে সুযোগ করে দিলেন সরকার রাওলাট আইন পাশ করে। বৈপ-বিক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। তাই সরকার তার মোকাবিলা করার জন্য স্যার সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন ১৯১৭ ডিসেম্বরে। এই কমিটি দমনমূলক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে একটি আইন প্রণয়ন করার সুপারিশ করেছিল ১৯১৮, ১৯শে জুলাই। এই আইনের অন্যতম হল জুরি ব্যতিরেকে (দ্ধদ্বার আদালতে বিচার, সন্দেহভাজন ব্যক্তি(দের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের জামানত আদায়, আপত্তিকর কাজকর্ম থেকে তারা যাতে বিরত থাকে তার ব্যবস্থা করা, বিনা বিচারে আটক ইত্যাদি। এই আইন তৈরি করার একটি সম্ভাব্য কারণ ছিল মন্টেগু প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে উদারনৈতিক সংস্কারে যেসব সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ (ুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হচ্ছিল, তাদের খুশি করা। ভারত সচিব মন্টেগু স্বয়ং এই আইন প্রণয়নের বিরোধী ছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত তিনি সম্মতি দেন। ভারতীয়রা একবাক্যে এই দমনমূলক আইনের বি(দ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। পাঞ্জাবে এই প্রস্তাবের নাম দেওয়া হল—''না উকিল, না আপীল, না দলিল''। বোম্বাই, যুক্ত( প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ওবেরারের পত্রিকাগুলিও এর বিরোতিা করে। ভি. জে. প্যাটেল, মালব্য, সাপ্রু প্রভৃতি নেতারা প্রতিবাদ জানালেন, সদ্যোরোগমুক্ত( গান্ধীজীও বিরাগ প্রকাশ করলেন। রোগমুক্তি(র পর শয্যায় শুয়ে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মালব্যকে

লেখা চিঠিতে এই ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত( করলেন এবং প্রতিবাদস্বরূপ সমগ্র ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ শু( করা স্থির করলেন। সত্যাগ্রহ সভা স্থাপিত হয় এবং প্রথমে ৩০ মার্চ ও পরে তার পরিবর্তে ৬ই এপ্রিল হরতাল ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ, ওয়াচা প্রভৃতি কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা এবং তিলকের শিষ্যদের মধ্যে কেলকার, মার্পাদে প্রভৃতি নেতা গান্ধীর বিরোধিতা করলেও বেসান্ত ও তিলকের অনুপস্থিতিতে শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, যমুনাদাস, দ্বারকাদাস প্রভৃতি হোম(ল লীগের সদস্য গান্ধীকে সমর্থন করলেন।

রাওলাট সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রভাব ভারতের সর্বত্র সমানভাবে অনুভূত হয়নি। বস্তুত সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসাবে দাবী করা হলেও রাওলাট সত্যাগ্রহ সমগ্র ভারতকে স্পর্শ করতে পারেনি। ৩০শে মার্চ দিল্লীতে হরতাল পালিত হয়। হরতাল কিন্তু শান্তিপূর্ণ ছিল না। পুলিশের গুলিতে কিছু লোক হতাহত হয়। দিল্লী আসার পথে ৯ এপ্রিল গান্ধীকে ট্রেনে গ্রেপ্তার করা হল। ধর্মঘটের ফলে যেসব শহরে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায় এবং কোন কোন (ে ত্রে শান্তি বিঘ্নিত হয়, সেগুলির মধ্যে অমৃতসর, লাহোর, পাঞ্জাবের ছোটখাটো বিভিন্ন শহর প্রভৃতি ছিল। এই পন্থায় আন্দোলন সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবে কিচলু ও সত্যপাল গ্রেফতার হওয়ায় তুমুল বি(ো ভ আরম্ভ হল, যার পরিণতি ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড। ১৩ এপ্রিল তারিখ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক বিশাল জমায়েতে বিনা প্ররোচনায় সামরিক অধিকর্তা নেজারেল ডায়ার গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র এই জনতার উপরে গুলি বর্ষণে অন্তত এক হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করা হল এবং জনসাধারণের নানা অপমানজনক শাস্তি দেওয়া চলল। বি(েকবি রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে ইংরেজদের দেওয়া নাইট খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন। গান্ধীজী ১৮ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিলে জুডিথ ব্রাউনের মতে—''The Rowlat Satyagraha.... was a manifest failure''। গান্ধী এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অহিংস রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে সরকার রাওলাট আইন প্রত্যাহারও করেননি। গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চল ছাড়া আন্দোলনের ব্যর্থতা অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, ''অধিকাংশ (ে ত্রে আন্দোলনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ কাজ করছিল, রাজনৈতিক চেতনা নয়।''

১৯১৯-এর মধ্যবর্তী সময়ে গান্ধীজী বুঝতে পারলেন যে, সর্বভারতীয় (ে ত্রে সত্যাগ্রহ সফল করতে গেলে কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের সম্মতি প্রয়োজন। তবু এই আন্দোলন গান্ধীকে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাওলাট সত্যাগ্রহের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পেল এবং এর ব্যর্থতা ব্রিটিশ সরকারের মুখোশ খুলে দিল। ভারত সচিব মন্টেগু এই হত্যাকাণ্ডকে ''Preventive murder'' বলে আখ্যা দিলেও দমনমূলক নীতি কিন্তু অব্যাহত রইল। রাওলাট সত্যাগ্রহের ব্যর্থতা গান্ধীকে খিলাফৎ আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করল।

## ২.৯ অনুশীলনী

(ক) গান্ধীজীর উত্থানের পটভূমি আলোচনা কর।

(খ) গান্ধীজীর নীতি কি ছিল? তিনি কিভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর সত্যাগ্রহের অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন?

(গ) চম্পারণ ও খেড়া সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর ভূমিকা আলোচনা কর।

(ঘ) ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলে গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনগুলির প্রকৃতি আলোচনা কর।

(ঙ) রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধীর জনপ্রিয়তার কারণ কি ছিল?

## ২.১০ গ্রন্থপঞ্জী


১। অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস** (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ, ১৩৯৭।

২। সুমিত সরকার, **আধুনিক ভারত** ১৮৮৫-১৯৪৭, কে. পি. বাগচি এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৩।

৩। Judith Brown, **Gandhi's Rise to Power—Indian Politics 1915-1922,** Cambridge, 1972।

৪। David Hendriman, **Peasant Nationalist of Guzrat, Kheda District 1917-1934,** (Delhi 1981)।

৫। Ravinder Kumar (ed.) **Essays on Gandhian Politics The Rowlatt Satyagraha of 1919** (Oxford, 1971)।